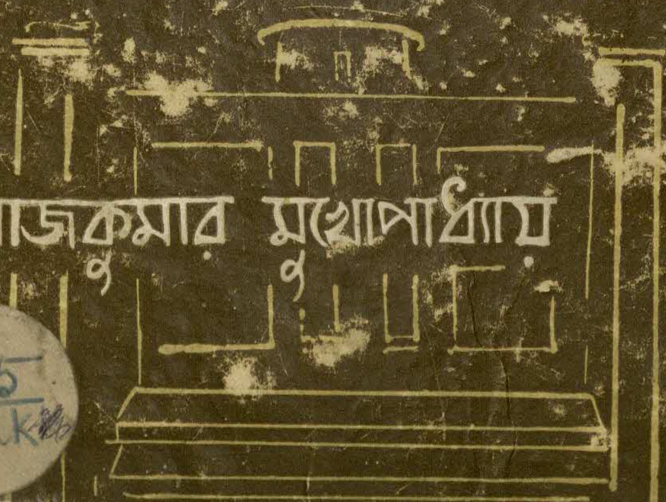


স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা



রাজকুমার মুখোপাধ্যায়



স্কুল ও কলেজের
গ্রন্থাগার পরিচালনা

স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., ডিপ. লিব

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ছয় টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াত খান লেন, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সম্ভবতঃ এই বইখানিই প্রথম ; এবং এ ধরনের একখানি বইয়ের যে প্রয়োজন আছে তা হয়ত কেউই অস্বীকার করবে না। বইখানির মধ্যে স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারকে ভিন্নভাবে বিচার করা হয়নি। এতে হয়তো অনেকের আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে সত্যই স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারকে ভিন্ন করে দেখার কোন ভিত্তি নেই, কারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত আর কোন কাজ নেই ; ফলে স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারকে শিক্ষার ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে। তবে ১০-১২ বছর ধরে স্কুল এবং কলেজে শিক্ষা পাবার পর যখন ভেবে দেখা যায়, মনে হয়, এতদিন ধরে কেন কষ্ট করে কতকগুলো পাঠ্য পুস্তক পড়া। সে সব পাঠ্য পুস্তক তো জীবনে আর কখনও উল্টে দেখবার প্রয়োজন হবে না। কিইবা কাজে লাগবে এতদিন ধরে যা পড়া হলো। কিন্তু এ কথা তো মানতে হবে যে এতদিনের পাঠ্য পড়ার আর কোন প্রয়োজন থাক আর না থাক বিচারকের মন নিয়ে পড়বার মত ভিত্তি তো গড়ে তোলা হলো। সেই ভিতের উপর নির্ভর করে নিজেকে পাঠের দ্বারা আরও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সুতরাং স্কুল ও কলেজে বইয়ের সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে সে সম্বন্ধ তো সারা জীবন কাজে লাগবে। স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারের কাজের ভিত্তি স্কুল-কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভর করে সত্যি, কিন্তু আজকাল আর সে কথা বলা চলে না। স্কুল ও কলেজের এখন প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বইয়ের সঙ্গে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা যাতে ছাত্রেরা শিক্ষার গণ্ডি পার হয়েও সে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে না পারে।

গ্রন্থাগারের কাজকে এভাবে বিচার করে দেখলে একথা স্বীকার করতেই হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারিকের কাজ অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা চিন্তা করলে সত্যই দুঃখ হয়। তাঁদের অবস্থা বিচার করলে মনে হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ কেরানীর মত। তাঁদের শিক্ষকদের মত পদমর্যাদা দেওয়া হয় না। অথচ গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব একজন শিক্ষক অপেক্ষা অনেক বেশি। আনন্দের কথা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। পরিষদের প্রচেষ্টা সফল হবে, সন্দেহ নাই।

আশা করি বইখানি স্কুলের ও কলেজের গ্রন্থাগারিকদের কাজে লাগবে।

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

চন্দননগর

এই লেখকের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অন্যান্য বই ঃ

গ্রন্থাগার পরিচালনা ঃ ২য় সংস্করণ

গ্রন্থাগার প্রচার

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ঃ ২য় সংস্করণ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন

জনসাধারণের গ্রন্থাগার ঃ পাঠক ও কর্মী

The Public Library : its aim and utility

পুস্তকের ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)

ব্যবহারিক পুস্তক-তালিকা (যন্ত্রস্থ)

সূচীপত্র

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গ্রন্থাগার ১-৩

গ্রন্থাগার প্রচার ৪-৬

গ্রন্থাগার-গৃহ ৭-১০

গ্রন্থাগারিক ১১-১৪

পুস্তক-নির্বাচন ১৫-৩৬

শিক্ষা-বিভাগ ও গ্রন্থাগারিক, ছাত্র ও শিক্ষক, ছাত্র, জনসাধারণের গ্রন্থাগার, অনুসন্ধানের বই, পুস্তক-সম্ভারের ভিত্তি, বই কেনবার জন্য অর্থ ও বই কেনা, বই কেনা, দৈনন্দিন পুস্তকাগমনের তালিকা, পুস্তক বিক্রেতা বা প্রতিনিধি, স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতা, ধার্য অর্থ খরচের হিসাব, পত্রিকার হিসাব, দান গ্রহণের দ্বারা পুস্তক সংগ্রহ।

বইয়ের যত্ন ৩৭-৪০

বই বাঁধাই, হিসাব রাখবার ছাপা কার্ডের নমুনা।

পুস্তক নির্গমনের তুলনামূলক হিসাব ৪১-৪৩

পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া, পুস্তক নির্গমনের মাসিক হিসাবের খাতা, নির্গমনের দৈনিক হিসাব।

পুস্তক প্রস্তুতি ৪৪-৪৭

মঞ্চে সাজানো বইয়ের নমুনা, তারিখ পত্র, ডাক-সংখ্যা।

পুস্তকের জাতি-বিচার ৪৮-৬৫

ডিউই'র দশমিক বিভাগ, ব্যবহারের নিয়ম, বিষয় অনুসারে জাতি-বিচারের অসুবিধা, লেখক-সংখ্যা, ডাক-সংখ্যা।

পুস্তক-তালিকা ৬৬-৮০

জাতি-বিচার বনাম তালিকা-প্রণয়ন, পুস্তকের তালিকা-প্রণয়ন।

তালিকা-প্রকরণ : ব্যবহারিক দিক ৮১-৮৩

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ ৮৪-৯৪

বিভিন্ন 'লিখন'-এর নিয়মাবলী, লিখনের সাধারণ নমুনা, কয়েকটি লিখনের নমুনা।

বই দেওয়া-নেওয়া ৯৫-৯৯

খাতায় হিসাব রাখার নমুনা, একখানি কার্ডে বই দেওয়া-নেওয়া, বইয়ের পকেটে কার্ড—নমুনা।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কমিটি ১০০-১০২

গ্রন্থাগার ব্যবহার ১০৩-১০৭

কি কি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে, আক্ষরিক বিন্যাস, পুস্তক-তালিকা, জাতি-বিচার, বইয়ের ব্যবহার।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গ্রন্থাগার

মানুষের সভ্যতা এখন যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সে অবস্থায় কোন একটি ব্যবসায়বিহীন জীবন স্বপ্ন বলে মনে হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনই এখন কোন একটি ব্যবসায়ের সঙ্গে বাঁধা। মানুষকে এখন কলের পুতুলের মত কোন একটি বাঁধাধরা সময় অনুযায়ী কাজ করে যেতে হয়।

শেষে আসে মৃত্যু তাকে মুক্তি দিতে এই সময়ের শৃঙ্খল থেকে।

আমাদের দেশে আগে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিকাশ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী বিকশিত হয়ে উঠত, ফলে ছাঁচে ঢালা মানুষ বড় একটা চোখে পড়ত না। তখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করা। এখনকার শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাঁচে ঢালা, ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত মানুষ গড়ে তোলা। কেবল শিক্ষারই উদ্দেশ্য তাই নয়, আধুনিক সভ্যতার উদ্দেশ্যই হচ্ছে sameness।

আধুনিক সমাজে নিজের স্থান করে নিতে গেলে কোন একটি ব্যবসায়ে পারদর্শী হতে হবে অর্থাৎ এই বিরাট সমাজযন্ত্রের অঙ্গের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ হয়ে কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন, তা না হলে আজ মানুষের সমাজের মধ্যে স্থান নেই। ব্যবসায়বিহীন মানুষের আজ সমাজের মধ্যে কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং নিজের পরিচয় দিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আজ কোন একটা ব্যবসায়ে পারদর্শী হতে হবে। স্কুলগুলির কাজ হচ্ছে লিখতে, পড়তে ও অঙ্ক করতে শিখিয়ে ছাত্রদের কোন একটি ব্যবসায়ে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা এবং কলেজের বা অন্যান্য কারিগরী শিক্ষার স্কুলগুলির কাজ হচ্ছে তাদের এক একটি ব্যবসায়ে পারদর্শী করে তোলা।

এই সব কারিগরদের এবং ব্যবসায়-পারদশা ব্যক্তিদের আধুনিক সমাজের প্রয়োজন আছে, কারণ তাদের সাহায্য বিনা সমাজযন্ত্র অচল হয়ে যাবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এই সব মানুষ মানুষের প্রতিমূর্তি মাত্র, এরা সম্পূর্ণ মানুষ নয়। কারণ সম্পূর্ণ মানুষের সংজ্ঞা একটা ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। এবং এভাবে মানুষের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করলে মানুষকে একটা সঙ্কীর্ণ

গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়। যন্ত্রচালিত পুতুলের এভাবে সংজ্ঞা দেওয়া চলে, কারণ পুতুলের ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু নেই। কিন্তু এরূপ জীবনকে সত্যই জীবন বলা চলে না, কারণ জীবনের বৈচিত্র্য আছে, জীবনের অগ্রগতি আছে, জীবনের অধোগতিও আছে। প্রত্যেক মানুষটিকে তার জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে, তার যতটা বিকাশ হওয়া দরকার, ততটা বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে। যে শক্তি নিয়ে সে এ পৃথিবীতে এসেছে সেই শক্তিটুকু তাকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, তাকে জানতে হবে তার বিকাশের কোন সীমা নেই।

সুতরাং সম্পূর্ণ মানুষ হতে গেলে ব্যক্তিকে জানতে হবে তার জীবনের বৈচিত্র্যকে, তার সমাজকে, যে ইতিহাসকে ভিত্তি করে সে গড়ে উঠছে সে ইতিহাসকে, তার সভ্যতাকে, তার আশপাশের মানুষকে। প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা অর্থাৎ যুগের সভ্যতার উপর ভিত্তি করে নিজেকে গড়ে তোলা, কারণ সভ্যতা কোন একটি যুগের চিন্তাধারার সমষ্টিগত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

নিজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী গড়ে উঠতে হলে ব্যক্তিকে স্বাধীন ভাবে জ্ঞান অর্জন করবার সুযোগ দিতে হবে। যে জ্ঞান সে অর্জন করবে তা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তা করবার স্বাধীনতা থাকা চাই।

স্কুলের শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে লিখতে ও পড়তে শেখানো এবং কোন একটা ব্যবসায়ের জন্য ছাত্রকে প্রস্তুত করা। কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটা ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া। ছাত্রেরা কলেজে যখন আসে তখন তাদের কোন একটা উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। কিছু কাল পূর্বেও ছাত্রেরা কোন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কলেজে পড়তে আসত কিন্তু এখন ছাত্রদের মধ্যে বেশির ভাগই কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পড়তে আসে না। তারা যেন পড়বার জন্যেই পড়তে আসে।

শিক্ষার আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং ছাত্রদের শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারের সংজ্ঞারও পরিবর্তন হয়েছে। স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার এখন কেবল পাঠ্য প্রস্তুত করবার জন্য পুস্তক সরবরাহ করে না। গ্রন্থাগারে ছাত্রদের এখন কিছুটা পাঠের স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। তারা যাতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পড়তে পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং কেবল স্কুল বা কলেজের চরিত্রগত উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য পুস্তক নির্বাচন না করে ছাত্রদের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন করতে হবে।

আধুনিক যুগে নিত্যই নতুন সত্যের আবিষ্কার হচ্ছে। আবার যেসব মতকে

সত্য বলে মেনে নেওয়া হত, সেগুলিও নতুন অনুসন্ধানের ফলে ভুল বলে প্রমাণ হচ্ছে। ফলে কলেজী লেখাপড়া নিয়ে আজকাল সমাজের মধ্যে মানুষের মত বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। কলেজের গণ্ডি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল কলেজী শিক্ষা পুরনো হয়ে যায়, সে শিক্ষা নিয়ে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলা মুশকিল। সমাজের অগ্রগতির তালে তাল রেখে চলতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হবে এবং বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে গেলে তার গ্রন্থাগার ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। স্কুলের ও কলেজের গ্রন্থাগারের কর্তব্য হচ্ছে, ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস দাঁড় করিয়ে দেওয়া, ছাত্ররা যাতে বই ভালোবাসতে শেখে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ছাত্রদের মধ্যে পাঠ অভ্যাসে দাঁড় করাতে গেলে নানা উপায়ে তাদের গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে এবং তা করতে গেলে যথাযথভাবে গ্রন্থাগার প্রচারের প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার-প্রচার

স্কুলের ছাত্রদের গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করতে গেলে "গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হবে" এ-হুকুম জারী করলে হবে না। তাদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করতে গেলে তাদের কাছে গ্রন্থাগার প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে গ্রন্থাগারে আসা দরকার। ছাত্রদের জোর করে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে শেখাবার চেষ্টা করা বাতুলতা। সুতরাং স্কুলের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে এদিকটা চিন্তা করবার জন্য সময় দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বেশির ভাগ ছাত্রই আইনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে চায় না। বাড়িতে পিতামাতার পড়বার জন্য শাসন, স্কুলে মাস্টার মশাইদের শাসন, এই দুই শাসনের মধ্যে পড়ে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি অকালে ক্ষয় হয়ে যায়। স্কুলে গ্রন্থাগার হচ্ছে একমাত্র স্থান যেখানে এসে ছাত্ররা মুক্তির আস্বাদ পায়, যেখানে এসে তারা নিজের ইচ্ছামত বই পড়তে পায়, নিজের ইচ্ছামত চিন্তা করবার সুযোগ পায়।

ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রচার করতে গেলে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে : (ক) ছাত্রেরা কোন্ সময়ে কোন্ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট সে খোঁজ রাখতে হবে, (খ) যা কিছু নতুন বা আধুনিক তা পড়বার সুযোগ ছাত্রদের দিতে হবে, এবং (গ) নতুন জিনিসের উপর ছাত্রদের আকর্ষণ বেশি সে কথা মনে রাখতে হবে।

(ক) ক্লাসে পাঠের সময় কি কি বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদের জানবার জন্য অনুসন্ধিৎসা হয় তা জানবার চেষ্টা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের জানাতে হবে গ্রন্থাগারে গেলে তাদের অনুসন্ধিৎসা মিটতে পারে। ক্লাসে পাঠের সময় তাদের গ্রন্থাগারের দিকে পরিচালিত করতে হবে। অনুসন্ধিৎসা জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রন্থাগারে পরিচালিত করতে না পারলে পরে তাদের আর গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে না, কারণ ক্লাসে যে ইচ্ছা তাদের জেগে উঠেছে তা ক্রমশঃ নির্বাপিত হবে। ক্লাসে পড়াবার সময় নানা প্রশ্ন উঠতে পারে, সেসব প্রশ্ন সামাজিক হতে পারে, জাতীয় হতে পারে, রাষ্ট্রীয় হতে পারে, রীতিনীতি সম্বন্ধীয় হতে পারে এবং এই সব-বিষয়ের উপরই ছাত্ররা আকৃষ্ট হতে পারে।

(খ) নতুন যা কিছু তার উপরই ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসা জাগতে পারে। গ্রন্থাগারে নতুন বই এলে তা যত উপায়ে পারা যায় ছাত্রদের নজরে আনবার চেষ্টা করতে হবে। নতুন বইয়ের তালিকা যাতে তাদের নজরে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে

হবে। নতুন বই যাতে তাদের চোখে পড়ে তার জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। ক্লাসে ছাত্রদের কাছে নতুন বইয়ের কথা বলতে হবে। পুস্তক মঞ্চের ভিতর ছাত্রদের যাতায়াত অবাধ হওয়া দরকার, কিন্তু মনে রাখতে হবে একই স্থানে একই বই প্রতিদিন দেখতে দেখতে মঞ্চ ও ছাত্রদের কাছে পুরানো ও ক্রমশঃ একঘেয়ে হয়ে যাবে। সেই কারণে সময়ে সময়ে মঞ্চের মধ্যে পুস্তক বিন্যাস অদল-বদল করা প্রয়োজন। নতুন বিষয় সম্বন্ধে বই এলে মাস্টার মশাইদের তা জানাতে হবে। ক্লাসে পড়াবার সময় কথা প্রসঙ্গে মাস্টার মশাইরা ছাত্রদের কাছে নতুন বিষয় সম্বন্ধে বলবেন এবং সেইসব বিষয় সম্বন্ধে পড়বার জন্য ছাত্রদের গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করবেন।

(গ) নূতনত্বের দিকে ছোট ছেলেদের একটা আকর্ষণ থাকেই। সেজন্যে নিত্য নতুনভাবে পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। মঞ্চে পুস্তকের স্থান অদল-বদল করার কথা আমরা আগেই বলেছি। সময়ে সময়ে শ্রেণী অনুযায়ী উপযুক্ত বই স্কুলের শ্রেণীতে শ্রেণীতে সাজিয়ে রাখতে হবে এবং ছাত্ররা বইগুলি যাতে হাতে তুলে নিয়ে পাতা উলটে দেখতে পারে তার সুযোগ দিতে হবে।

গ্রন্থাগার প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রন্থাগার যে আছে তা ছাত্রদের কাছে বার বার জানান। সেজন্যে গ্রন্থাগারিককে ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে হবে, ছাত্রদের নানা উৎসবে যোগ দিতে হবে এবং সুযোগ হলেই কথায় কথায় গ্রন্থাগারের কথা তুলতে হবে।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে স্কুলের গ্রন্থাগারের সব সময়ে সংযোগ রাখতে হবে। প্রচারের ক্ষেত্রে, জনসাধারণের গ্রন্থাগারের প্রচার স্কুলের গ্রন্থাগারের মধ্যে করতে হবে। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে ছাত্রদের পড়বার মত নতুন বই এলে তা যাতে স্কুলের গ্রন্থাগারে এবং স্কুলের ছাত্রদের কাছে প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল থেকেই যাতে ছাত্রদের জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কারণ স্কুল বা কলেজের শিক্ষার পর ছাত্রদের জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পাঠের জন্যে যেতে হবে।

স্কুলের গ্রন্থাগারকে ছাত্রদের আকর্ষণীয় স্থান করে তুলতে গেলে গ্রন্থাগারিকের চরিত্রের কতকগুলি গুণ থাকা দরকার। যে কোন ছাত্রই তার কাছে আসুক না কেন, তার সঙ্গে সব সময় অমায়িকভাবে কথা কইতে হবে। কোন ছাত্রের কাছে গম্ভীর ভাবে নিজের পদমর্যাদা জাহির করা তার পক্ষে একান্ত অন্যায়, কারণ শিশু-মনে সব সময়ে এরূপ ভাব বিতৃষ্ণাকর হয় এবং শিশু এ ধরনের লোককে সব সময়

এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে ; ফলে গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে ছাত্রের কোন কালেই একটা ভালো সম্বন্ধ স্থাপন হয় না। ছাত্রদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের ব্যবহার এমন হওয়া দরকার যাতে ছাত্রেরা তাকে নিজেদেরই একজন মনে করে এবং "গ্রন্থাগার যেন তাদেরই" এই ধারণা তাদের মনে জেগে ওঠে। গ্রন্থাগারিককে ছোট ছেলেদের ভালোবাসতে শিখতে হবে, সব সময়েই হাসিমুখে ছাত্রদের সঙ্গে কথা কইতে হবে।

গ্রন্থাগার-গৃহ

গ্রন্থাগার-গৃহ কিরূপ হবে, তার অবস্থিতিই বা কিরূপ হবে, তা দুদিক থেকে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ স্কুল-গৃহ যদি নতুন করে তৈরী হয় এবং স্কুলে গ্রন্থাগার থাকবে তা যদি ঠিক করা হয় তা হলে স্কুলের গ্রন্থাগার যেরূপ হওয়া উচিত ঠিক সেইরূপ ভাবেই গৃহ নির্মাণ করবার পূর্বে গ্রন্থাগারের নকশা করা প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যা প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ঘরগুলির অবস্থান কিরূপ হবে, তা একজন সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক, যিনি গৃহের নকশা করবেন, তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন এবং গৃহ-নির্মাণকারী গ্রন্থাগারিকের নির্দেশ অনুযায়ী নকশা তৈরি করবেন।

এরূপ ক্ষেত্রে সমুদয় স্কুল-গৃহের মধ্যে গ্রন্থাগারের অবস্থান এমন হওয়া দরকার যাতে ছাত্রদের গ্রন্থাগারে যাতায়াত করার কোন অসুবিধা না হয়, অর্থাৎ সমুদয় স্কুল-গৃহের মাঝামাঝি স্থানে গ্রন্থাগারের অবস্থান হওয়া চাই। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্থানটি এমন হওয়া চাই যাতে ছাত্রদের পাঠের সময় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে বেশি আওয়াজ না আসে। তাছাড়া গ্রন্থাগার-গৃহ স্কুলের খেলার মাঠ থেকে যতটা দূরে হয় ততই ভালো। গ্রন্থাগার-গৃহের নকশা করবার সময়, পরে প্রয়োজন হলে যাতে গৃহ বাড়ান যেতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলন ক্রমশঃ বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সংখ্যাও বাড়বে, সুতরাং গ্রন্থাগার-গৃহকেও বাড়াতে হবে। এদিকে নজর না রেখে নকশা করলে পরে মহা-মুশকিলে পড়তে হবে।

ছাত্রেরা যেখানে বসে পড়বে, সেই জায়গা, পুস্তকমঞ্চ এবং অন্যান্য গৃহে যথেষ্ট আলো বাতাস থাকা চাই, এবং তা যতটা প্রাকৃতিক হয় ততই ভালো। আলো উপর দিক থেকে যত আসবে ততই ভালো।

ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী পাঠকক্ষের পরিমাপ করতে হবে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ২৫ থেকে ৩৫ স্কোয়ার ফুট স্থান হিসাবে পাঠ কক্ষের আয়তন হওয়া প্রয়োজন। যে শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি ছাত্র সেই শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা গ্রন্থাগারে পড়তে আসবে ধরে নিয়ে আয়তনের হিসাব করা দরকার। এমন কি এই সংখ্যার সঙ্গে আরও ২০ জন ছাত্র বেশি ধরলে ভালো হয়। আমাদের দেশের স্কুলগুলির এখন যা অবস্থা, সে অবস্থায় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের হিসাব উপরোক্ত

মতে করতে গেলে পাঠকক্ষের আয়তন খুবই বড় করতে হবে। অর্থাৎ কোন শ্রেণীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যা যদি ধরা হয় ৮০ জন, তাহলে পাঠকক্ষের আয়তন হবে (৮০+২০)×২৫=১০০×২৫=২৫০০ স্কোয়ার ফুট।

আলো প্রাকৃতিক হলে খুবই ভালো হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক আলোর অভাব হলে পাঠকক্ষ আলোকিত করতে হবে। আলোর ব্যবস্থা করবার সময় মনে রাখতে হবে, পাঠকক্ষ ২০ ফুটের বেশি চওড়া হলে কক্ষের দুদিকেই আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং চেয়ার ও টেবিল এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে পাঠকের পিঠের দিকে আলো না থাকে।

গ্রন্থাগার-গৃহের ভিতর পুস্তকমঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্র এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সহজেই সকল স্থানে নজর রাখা যায়।

স্কুলের গ্রন্থাগারের পুস্তকমঞ্চের মাপ হয় সাধারণতঃ ৭′ ফুট উঁচু, তাকগুলি লম্বা হবে ৩′ ফুট, চওড়া হবে ৮″ ইঞ্চি এবং পুরু হবে অন্ততঃ ১″ ইঞ্চি। এ ধরনের মঞ্চে সাধারণত থাকবে ৭টি তাক এবং বই ধরবে ২০০। কিন্তু প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য তাকের উচ্চতা ৭′ ফুট হলে বেশি উঁচু হয়ে যাবে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ স্কুলেই প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র থাকে। সুতরাং মঞ্চ করবার সময় সে কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। কিন্তু একই গ্রন্থাগারের পুস্তকমঞ্চ দু রকমের হলে গ্রন্থাগারের মঞ্চ বেমানান হয়ে যাবে এবং তা করাও হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে না।

আমরা পূর্বেই বলেছি গ্রন্থাগারের আবহাওয়া স্কুলের শিক্ষাগৃহের আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া দরকার। গ্রন্থাগারে এসে ছাত্ররা যেন মনে না করে তারা শিক্ষাগৃহে এসেছে। এখানে তাদের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সুতরাং গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে যেসব চেয়ার টেবিল থাকবে তা শিক্ষাগৃহের চেয়ার টেবিলের মত হবে না।

টেবিল যে একই ধরনের হবে তার কোন মানে নেই। গোল ও সমকোণী টেবিল করা যেতে পারে। টেবিল যেমনই হোক, তা ৫′×৩′ মাপের চেয়ে বড় হবে না। একখানি এই মাপের টেবিলে ছয়জন ছাত্র বসবে। উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য যে টেবিল হবে তার উচ্চতা হবে ৩′ ৬″ (তিন ফুট ছয় ইঞ্চি) এবং নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য যে টেবিল হবে তার উচ্চতা হবে ২৪″ ইঞ্চি থেকে ২৬″ ইঞ্চি।

চেয়ারগুলি হবে সাধারণ কিন্তু মজবুত এবং আরামদায়ক। চেয়ারের উচ্চতা হবে ১৮″ ইঞ্চি এবং নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের চেয়ার হবে ১৪″ ইঞ্চি ও ১৬″ ইঞ্চি উঁচু।

গ্রন্থাগার-গৃহে প্রবেশ করবার মুখেই হবে বই দেওয়া-নেওয়ার স্থান, কারণ এই স্থান থেকে গ্রন্থাগারের ভিতর সকল স্থানে নজর রাখা সম্ভব হয়। এখানে বই দেওয়া-নেওয়ার জন্য থাকবে একটি টেবিল। এ টেবিল সাধারণতঃ বিশেষ আকারের হয়। এই টেবিলে কয়েকটি দেরাজ থাকা দরকার। বই দেওয়া-নেওয়ার ট্রেগুলি যখন কাজে লাগবে না তখন সেগুলিকে ড্রয়ারের ভিতর চাবি দিয়ে রাখতে হবে।

তালিকার দেরাজ সাধারণত থাকবে গ্রন্থাগার থেকে বার হবার পথের কাছাকাছি, না হয় গ্রন্থাগারের মাঝামাঝি স্থানে। গ্রন্থাগারের তালিকার দেরাজের ট্রেগুলি সাধারণ ৫" × ৩" মাপের কার্ড ধরবার মত হবে। এক একটি দেরাজে অন্ততঃ ১০০০ থেকে ১৫০০ কার্ড ধরা চাই। এক একটি দেরাজে অন্ততঃ ছয়টি ট্রে থাকবে। এরূপ কয়টি দেরাজ থাকবে তা নির্ভর করবে কি কি তালিকা থাকবে তার উপর। বিশেষজ্ঞ ব্যবসাদারের কাছ থেকে তালিকার দেরাজ কেনা ভালো।

এ ছাড়া, পত্রিকা রাখবার র‍্যাক, সংবাদপত্র রাখবার র‍্যাক, পুস্তক প্রদর্শনী, বই নিয়ে যাবার জন্য ট্রলি ইত্যাদি রাখতে হবে।

কিন্তু বেশির ভাগ স্কুলেই উপরের বর্ণনা মত গ্রন্থাগার করা সম্ভব হবে না, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তৈরি করা স্কুল-বাড়ির মধ্যে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে একখানি ঘরের মধ্যেই গ্রন্থাগারের স্থান সঙ্কুলান করতে হবে। এই ঘরের মধ্যেই থাকবে পুস্তকমঞ্চ, গ্রন্থাগারিকের বসবার স্থান, ছাত্রদের বসে পড়বার ঘর ইত্যাদি। তবে গ্রন্থাগার-গৃহ যেরূপই হোক, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্কুলান করতে হবে :—

১। মূল গ্রন্থাগার

২। গ্রন্থাগারিকের ঘর

৩। ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ঘর

৪। পাঠকক্ষ

৫। জিনিসপত্র ও যে সব বই প্রস্তুত করা হয়নি সে সব বই রাখবার ঘর।

স্থানের যখন সত্যই অভাব তখন গ্রন্থাগারের যে অংশগুলি না হলে নয় সেগুলি রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন গ্রন্থাগারিকের কাজ করবার জন্য একটি স্থান থাকা চাই, কারণ সেই স্থানে সব সময় নতুন বই থাকবে, গ্রন্থাগারিককে পুস্তক প্রস্তুতির কাজ করতে হবে। এসব কাজের জন্য তার একটু আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার।

কলেজের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছু নেই। কেবল এইটুকু মনে রাখতে হবে, কলেজের গ্রন্থাগারে যে আসবাবপত্র হবে তা প্রমাণ সাইজের হবে। কেবল যেসব কলেজে গবেষণার কাজ হয়, সেসব কলেজে গবেষকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ তাদের নির্জনে কাজ করতে হবে এবং তাদের কাছে সব সময়েই কিছু বই জড় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থাগারিক

আমাদের দেশে স্কুলের গ্রন্থাগারের ভার সাধারণতঃ স্কুলের কোন একজন শিক্ষকের উপর থাকে। কলেজের গ্রন্থাগারে আজকাল একজন গ্রন্থাগারিক রাখা হয় সত্য, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একজন অধ্যাপকের উপর গ্রন্থাগারের ভার থাকে। এ অবস্থার কারণ—গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা কিরূপ হওয়া উচিত তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তারা ঠিক মত জানেন না।

স্কুল বা কলেজে গ্রন্থাগারিকের অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়, যদি স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারের কাজ কি তা বিচার করে দেখা যায়।

স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগার হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এ অঙ্গের কাজ হচ্ছে স্কুল বা কলেজের শিক্ষার কাজে সহযোগিতা করে কাজের সম্পূর্ণতা আনা। স্কুল ও কলেজের কাজ হচ্ছে পাঠ্য অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া এবং গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে পাঠ্য প্রস্তুত করবার জন্য ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের পুস্তক সরবরাহ করা। সুতরাং এ কথা বলা যায়, গ্রন্থাগারিক শিক্ষা না দিলেও তার শিক্ষকের সমুদয় গুণ থাকা চাই। ফলে স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা শিক্ষকের সমান হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকের সহিত গ্রন্থাগারিকের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষার বিষয়গুলি সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের যদি যথাযথ ধারণা না থাকে তা হলে তার পক্ষে যথাযথ ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

গ্রন্থাগারিকের কাজের দুটি দিক আছে। একদিকে গ্রন্থাগারিকের কাজ হল স্কুল বা কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সহযোগিতা করা, অন্যদিকে গ্রন্থাগার যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা করতে পারে সেজন্য যথাযথভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা। এ দুই দিক থেকে গ্রন্থাগারিকের অবস্থা বিচার করে দেখলে আমরা বুঝতে পারব, কলেজের বা স্কুলের যে কোন উর্ধ্বতন শিক্ষকের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব অপেক্ষা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব অনেক বেশি। গ্রন্থাগারের পরিচালক হিসাবে পরিচালনার অভাবের জন্য গ্রন্থাগারিককেই দায়ী হতে হবে এবং শিক্ষক বা অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষার ভালো-মন্দর জন্য গ্রন্থাগারিক দায়ী।

এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে গেলে যিনি কলেজের বা স্কুলের গ্রন্থাগারিক হবেন

তাঁকে প্রথমত যে কোন উর্ধ্বতন শিক্ষক বা অধ্যাপকের মত শিক্ষা পেতে হবে, উপরন্তু তাঁকে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। ফলে স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ও তাঁর বেতন স্কুল বা কলেজের উর্ধ্বতন শিক্ষক বা অধ্যাপকের সমান হওয়া চাই।

স্কুলে সাধারণতঃ আলাদা করে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয় না। একজন শিক্ষকের উপর গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। অবশ্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংখ্যা দু-এক হাজার হলে এবং পাঠক সংখ্যা নগণ্য হলে যে কোন লোক, একটু অভিজ্ঞতা থাকলে, গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষকের পক্ষে সে কাজটুকু করাও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না, কারণ শিক্ষা দিতেই তাঁর সময় কেটে যাবে। গ্রন্থাগার পরিচালনার উপর নজর দেবার সময় দেওয়া এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে চিন্তা করার মত অবস্থাও তাঁর থাকবে না।

তার উপর ঠিক শিক্ষকের মন নিয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কাজ করা চলে বলে মনে হয় না, কারণ স্কুল বা কলেজের ক্লাসের আবহাওয়া ও গ্রন্থাগারের আবহাওয়া, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটিতে থাকে শিক্ষার বাঁধাবাঁধি—সেখানে ছাত্রের স্বাধীনতা নেই, আর গ্রন্থাগারে ছাত্র পড়তে আসে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে। একদিকে ছাত্রের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই, অথচ গ্রন্থাগারে ছাত্রের পাঠ কতকটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর। একদিকে শিক্ষার বিষয়বস্তু জোর করে ছাত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, অন্যদিকে ছাত্রের নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রকে বই সরবরাহ করা হয়। কিন্তু স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারে কেবল স্কুলের বা কলেজের শিক্ষায় সহায়তা করা হয়। বই পড়া ছাত্রদের মধ্যে যাতে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় সেদিকে গ্রন্থাগারিকের নজর রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে শিক্ষকের মনোভাব নিয়ে গ্রন্থাগারিক যদি ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তা হলে ছাত্ররা সব সময় গ্রন্থাগারকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবে।

এ সম্বন্ধে ভারতের Secondary Board of Education-এর ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধীয় মতামত উল্লেখযোগ্য। এই Report, Mudaliar Commission-এর Report নামে পরিচিত। এই Report-এর এক স্থানে বলা হয়েছে :—

"Moreover the standard of interest and general knowledge is so deplorably poor in Secondary Schools.........that it has

become a matter of highest priority to promote the desire and the habit of general reading among our student. This means in effect the establishment of an intelligent and effective library service.

"………The person in charge is often a clerk or an indifferent teacher who does the work on a part time basis and has neither a love for books nor knowledge of library technique".

এ ছাড়া Mudaliar Commission-এর Report-এ আরও অনেক কিছু আছে যা স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সত্যই প্রযোজ্য। এ সম্বন্ধে গ্রন্থাগার সংগঠনের অধ্যায়ে আমরা আরও অনেক কথা বলব।

গ্রন্থাগারিক যদি শিক্ষকের মন নিয়ে গ্রন্থাগারে কাজ করেন তা হলে তাঁর সব সময়ে চিন্তা হবে ছাত্রদের কি বই পড়া দরকার। গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক যদি মাস্টারি করতে শুরু করেন তাহলে গ্রন্থাগারে যত বই-ই থাকুক না কেন, গ্রন্থাগার ছাত্রদের কাছে আকর্ষনীয় স্থান হয় না। এক্ষেত্রেও মুদালিয়ার কমিশনের মতামত উল্লেখযোগ্য :—

"The guiding principles in selection should be not the teachers' own idea of what books the students should read but their natural and psychological interests. If they are more attracted at a particular age to stories of adventure or travels or biographies or even detection and crimes, there is no justification for forcing them to read poetry or classics or belles-letters"

কলেজের ও স্কুলের গ্রন্থাগারিকের শিক্ষা হবে উর্ধ্বতন শিক্ষকের সমান এবং তাঁর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা থাকা চাই এ কথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারা যাবে, স্কুলের গ্রন্থাগারিকের অভিজ্ঞতা কলেজের গ্রন্থাগারিকের অপেক্ষা বেশি হওয়া প্রয়োজন। কারণ কলেজের ছাত্রেরা পরিণতবয়স্ক, তাদের মনের পরিণতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে গেছে—তা সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক। তাদের চরিত্রের আর পরিবর্তন ঘটান যাবে না। কিন্তু স্কুলের গ্রন্থাগারিককে অপরিণতবয়স্ক বালকদের নিয়ে কাজ করতে হয়। এইসব বালকের এখনও মনের পরিণতি ঘটেনি। এদের এখনও ঠিকমত গড়ে তোলার সুযোগ থাকে। এই অবস্থাতেই যদি ছাত্রদের গ্রন্থাগারমনা করে তুলতে পারা যায়, তা হলে কলেজে গিয়ে তাদের

গ্রন্থাগারমনা করে তোলবার প্রশ্ন ওঠে না। এইসব কারণে স্কুলের গ্রন্থাগারিকের শিশুমন সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা থাকার প্রয়োজন বলে মনে হয়। গ্রন্থাগারিক যদি আত্মকেন্দ্রী হয় তা হলে তার রূপটা শিশুমনের মুকুরে প্রতিফলিত হবেই, কারণ শিশুমন বড় বেশি অনুভূতিশীল। ফলে শিশু "জুজুর ভয়ে সব সময় দূরে থাকবার চেষ্টা করবে"। সে নিজেকে আর প্রকাশ করতে চাইবে না। গ্রন্থাগারিককে শিশুদের মধ্যে একজন শিশু হয়ে থাকতে হবে এবং গ্রন্থাগারে এসে যাতে শিশুরা মাস্টারির হাত থেকে মুক্তি পায়, সেজন্য গ্রন্থাগারের আবহাওয়াকে অনুকুল করে রাখতে হবে। "আমাদের গ্রন্থাগার" এই মনোভাব ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে।

স্থতরাং গ্রন্থাগারের যা দৈনন্দিন কাজ তা সবই গ্রন্থাগারিককে দেখতে হলে তার ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বই দেওয়া-নেওয়া, বই কেনা, বইয়ের হিসাব রাখা, এসব কাজের জন্য স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারে অন্যান্য কর্মীর প্রয়োজন হবে। গ্রন্থাগারিক এদের কাজ দেখাশুনা করবে মাত্র। গ্রন্থাগারের কর্মী ভালো না হলে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলন যতই ভালো হোক না কেন তা কাজের হবে না। পুস্তক-সম্ভারের প্রত্যেক পুস্তককে পাঠকের গোচরে আনতে হবে, তা না হলে বই থাকা না-থাকার সমান। স্থতরাং গ্রন্থাগারের কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না-হচ্ছে তা বিচার করে দেখতে গেলে কর্মীদের ও পুস্তক সংকলনকে একসঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে, কারণ উভয়ে উভয়ের কাজের পরিপূরক।

পুস্তক-নির্বাচন

স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারের কাজ কি তা আমরা পূর্বে বলেছি। আমরা বলেছি, স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে স্কুলের বা কলেজের উদ্দেশ্য সফল করা অর্থাৎ স্কুলে বা কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সম্পূর্ণ করা। কিন্তু এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের উপর নজর না রেখে নির্বাচিত হলে তা কোনই কাজের হবে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাগারের কাজ পুস্তক-সম্ভারের কার্যকারিতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। পুস্তক-সম্ভার কার্যকারী কিনা তা জানা যায় নানা উপায়ে। পুস্তক নির্গমনের দৈনিক হিসাব ও অপূর্ণ চাহিদার দৈনিক হিসাব থেকে কতকটা জানা যায় সঞ্চিত পুস্তকের মধ্যে কোথায় কি অভাব আছে। এ ছাড়া আরও অনেক উপায় আছে যা থেকে পুস্তক-সম্ভারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। কিন্তু সে উপায়গুলি সন্দেহজনক, কারণ উপায়গুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের উপর। তবে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাৎ স্কুল ও কলেজের উদ্দেশ্য ছাঁচে ঢালা, ফলে উপরোক্ত দুইটি উপায়ের উপর নির্ভর করে সংকলিত পুস্তকের কার্যকারিতা বিচার করে দেখায় কোন বাধা নেই।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভার সুনির্বাচিত হলেও পরিচালনার অভাবে তা অকেজো হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং গ্রন্থাগারকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক হিসাবে গড়ে তুলতে গেলে পুস্তক-নির্বাচনের উপর কেবল নজর রাখলে হবে না, পুস্তক-নির্বাচনের পরিচালনাও ঠিকমত হওয়া দরকার।

সত্যি কথা বলতে কি, স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারে পুস্তক-নির্বাচন করা বিশেষ একটা সমস্যা নয়, কারণ গ্রন্থগারে যারা পড়তে আসবে তাদের উদ্দেশ্য এক। তারা আসবে যে শিক্ষা তারা শিক্ষক মহাশয়দের কাছ থেকে পাচ্ছে তা পরিপূরণ করবার জন্যে। তারা আসবে শিক্ষক মহাশয়দের দ্বারা নির্দেশিত বই পড়বার জন্যে এবং সেই সমুদয় বই সাধারণতঃ স্কুল বা কলেজের পাঠ্য পুস্তকের পরিপূরক। ফলে, গ্রন্থাগারের কাজ হবে প্রথমতঃ পাঠ্য অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন করা।

গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ছাত্রকে পাঠ্য অনুযায়ী বই পড়ার সুযোগ দেওয়া এবং সেইসঙ্গে ছাত্রের যাতে গ্রন্থাগারে এসে বই পড়া অভ্যাসগত হয়ে যায় সে-দিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেজন্যে তাকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী, পাঠ্য ছাড়াও, অন্য

বই পড়বার সুযোগ দেওয়া। সেজন্যে সাধারণ জ্ঞানের বই এবং ছাত্রের পাঠের মান অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের বই রাখা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সব কলেজে গবেষণার কাজ হয় না। যেসব কলেজে গবেষণার কাজ হয় সেসব কলেজে কিন্তু পুস্তক নির্বাচনের আর একটি দিক আছে। সেটি হচ্ছে যে যে বিষয়ের উপর গবেষণা হচ্ছে বা যে যে বিষয়ের উপর গবেষণা হতে পারে সেই সেই বিষয়ের গবেষণামূলক সকল বই-ই সঞ্চয় করে রাখতে হবে। কেবল বই নয়, যে যে বিষয়ের উপর গবেষণা হওয়া সম্ভব সেই সেই বিষয়ের উপর পত্রিকা ও পুস্তিকা এবং সেই সেই বিষয়ের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত প্রবন্ধ—সব কিছুই সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে পুস্তক সংকলন করা খুব সহজ কাজ নয় এবং তাতে বহু অর্থের প্রয়োজন। অর্থ যদি ধার্য করা হয় তা হলে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ ধার্য করা দরকার। এ ধরনের পুস্তক সংকলন করতে হয় বছরের পর বছর ধরে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংকলন হল গ্রন্থাগারের প্রাণ, কিন্তু পুস্তক-সংকলনের প্রত্যেকটি বই প্রাণবন্ত হলে তবেই গ্রন্থাগার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারিকের কর্মী, ছাত্র এবং শিক্ষকেরাও প্রাণবন্ত পুস্তকের সান্নিধ্যে এসে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পরিচালনা : শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের শক্তি অনেকটা নির্ভর করে বই কেনবার জন্য ধার্য করা অর্থের উপর। এই অর্থ ধার্য করেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার যাঁদের উপর আছে তাঁরা। কিন্তু টাকা ধার্য করার ভিত্তি কি হবে, সেইটাই হবে একটা সমস্যা। টাকা ধার্য করার ভিত্তি সম্বন্ধে মতামত গ্রন্থাগারিকের দিক থেকে আসা দরকার, কারণ গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজন যতটা ভালো করে জানবে ততটা ভালো করে জানা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর বাৎসরিক প্রয়োজনের একটা হিসাব করে রাখা। যে টাকা ধার্য করা হবে সে টাকার কাজ হবে প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটান। গ্রন্থাগারের ভিত্তিগত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ভিত্তিগত পুস্তক-সংকলন গড়ে তোলবার জন্য ও ভিত্তিগত সংকলনের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য আলাদা টাকা ধার্য করা দরকার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার যাঁদের উপর আছে তাঁদের সকলের কাছ থেকেই পুস্তকের প্রস্তাব আসবে এবং প্রস্তাবিত পুস্তক কেনা হবে কিনা তা গ্রন্থাগারিককে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শিক্ষা-বিভাগ ও গ্রন্থাগারিক

ছাত্রদের পুস্তক চাহিদার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধে নির্দেশের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, শিক্ষক এবং অধ্যাপকরা পুস্তক-নির্বাচন সম্বন্ধে সর্বপ্রধান এবং প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করেন।

শিক্ষা-বিভাগের কাজ হচ্ছে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া আর গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে পুস্তক সরবরাহের দ্বারা সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করা। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই গ্রন্থাগারে আসে বই পড়বার জন্যে। শিক্ষক আসেন যে বিষয়টি ছাত্রদের কাছে বলতে হবে তা তৈরি করে নেবার জন্যে, এবং তিনি ছাত্রদের সেই বিষয় সম্বন্ধে নানা পুস্তকের ইঙ্গিত দেন। ছাত্রেরা গ্রন্থাগারে আসে সেইসব বই পড়বার জন্যে। স্থতরাং একথা আমরা বলতে পারি যে শিক্ষা-বিভাগের ও গ্রন্থাগারের কাজের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের সঙ্গে পুস্তকের সম্বন্ধ ঘটান।

এতক্ষণ আমরা যা কিছু বললাম তা থেকে মনে হয় পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ কোন কাজ নেই। ছাত্রদের কি কি বই পড়তে হবে তা শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা যত ভালোভাবে জানবেন ততটা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে, শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হলেও পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পুস্তক ও কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর কি কি বই বার হচ্ছে, এ সব সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের জানবার স্থযোগ যত বেশি তত বেশি স্থযোগ শিক্ষক বা অধ্যাপকদের থাকতে পারে না। গ্রন্থাগার প্রকাশকদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে পুস্তক-তালিকা পায় এবং পুস্তক-তালিকা সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক অভিজ্ঞ। উপরন্তু সাময়িক পত্রিকায় যে সকল পুস্তকের পরিচয় বার হচ্ছে তা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে পড়ার স্থবিধা যত বেশি তত বেশি স্থবিধা শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নেই, কারণ তাঁদের সেসব পুস্তক-পরিচয় পড়বার সময়ের অভাব এবং সে স্থযোগও তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে নেই।

স্কুল ও কলেজে বই কেনবার জন্য অর্থ ধার্য করা হয় এক একটি বিষয় শীর্ষে এবং এই অর্থ খরচ করবার ভার থাকে বিভাগীয় কর্তাদের উপর। এদিক থেকে কিন্তু গ্রন্থাগারিকেরও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। অর্থ যাতে যথাযথভাবে খরচ হয় সেদিকে গ্রন্থাগারিকের নজর রাখা দরকার। বৎসর সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই যাতে শীর্ষ অনুযায়ী ধার্য করা অর্থ খরচ না হয়ে যায় সে বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের সব সময়

সচেতন থাকা দরকার। শিক্ষক বা অধ্যাপকের দ্বারা পুস্তক প্রস্তাবিত হয় সত্য কিন্তু সব বই যে গ্রন্থাগারের কাজে লাগবে, তার কোন মানে নেই। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের সে বিষয়ে বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। পুস্তক-নির্বাচন সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের নিজের কোন দুর্বলতা থাকা খুবই বিপজ্জনক। শিক্ষা-বিভাগের কোন ব্যক্তির মন রাখবার জন্যে বই কেনা, বা নিজের কোন বিষয়ের উপর দুর্বলতার প্রভাবে বই কেনা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে তাঁর কর্তব্যের অবহেলা করা ছাড়া আর কিছু নয়। যে বই কেনা হচ্ছে সে বইয়ের সত্যই কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা বিচার করে দেখবার মত বিবেচনা শক্তি গ্রন্থাগারিকের থাকা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় বই কেনার বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারিককে সব সময় প্রতিবাদ করতে হবে। কলেজে অনেক সময় কোন বিরল বই বহুমূল্যে ক্রয় করবার জন্য অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসতে পারে। এ ধরনের বই সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে রাখা হয় তা বিরল বলে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন বইয়ের চাহিদা না থাকলে তা গ্রন্থাগারে রাখার কোন মানে নেই, কারণ বই বিরল হলেই যে তা প্রয়োজনীয় হবে এ ধারণা ভুল। ফলে সে ধরনের বই কেনা মানে বই কেনবার জন্যে ধার্য অর্থের অপচয় করা। এ ধরনের বই যদি একান্তই প্রয়োজনীয় হয়—বিশেষ করে কলেজে—তা হলে সে বই অন্য কোন গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে আসা যেতে পারে।

যেসব বই কেনবার জন্যে প্রস্তাবিত হয়, সেসব বই কেনবার জন্যে চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হয় সাধারণতঃ গ্রন্থাগার কমিটির দ্বারা। এই কমিটির যাঁরা সভ্য হন তাঁরা সাধারণতঃ স্কুল বা কলেজের শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তাই মনে হয় প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সেই কমিটির দ্বারা প্রস্তাবিত পুস্তক অনুমোদিত করা উচিত। এই ধরনের কমিটির পক্ষে কোন্ বই কাজে লাগবে বা কোন্ বই কাজে লাগবে না তা যথাযথভাবে বিচার করে দেখা সম্ভব হবে, কারণ সেরূপ কমিটির প্রত্যেক সভ্যই স্কুল বা কলেজের শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উপরন্তু ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব পুস্তক সংকলনের উপর থাকবে না।

পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যপুস্তকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পুস্তক কেনার ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রন্থাগারিকই দায়ী, কারণ এসব বই গ্রন্থাগারিককেই নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে এসব বইয়ের ভালোমন্দ বিচার করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব এ ধরনের পুস্তক

নির্বাচনের উপর প্রতিফলিত হওয়া খুবই সম্ভব। এদিক থেকে গ্রন্থাগার কমিটি গ্রন্থাগারিককে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। স্কুল বা কলেজে যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁরা এসব বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে সাহায্য করতে পারেন, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই একটি না একটি বিষয়ে পারদর্শী, কিন্তু গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সকল বিষয়ে পারদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। সকল বিষয়েই গ্রন্থাগারিকের কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এ কথা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু তাঁর পক্ষে সকল বিষয়ে পারদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। তবে পুস্তক-নির্বাচনের পন্থা সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। আজকাল গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ব্যতীত আর কারো পক্ষে পুস্তক-নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, কোন কালেই কোন গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংকলন সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং শিক্ষার ধারাও যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে। কেবল তাই নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যেরও যুগে যুগে পরিবর্তন হয়। ফলে পুস্তক-সংকলন অসম্পূর্ণ ও অকেজো হয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। শিক্ষার পরিবর্তনের অপেক্ষায় বসে থাকলে গ্রন্থাগারিককে পুস্তক-সংকলনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে হবে। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের পূর্ব থেকেই জানা দরকার কি ধরনের পরিবর্তন সম্ভব, এবং সেই পরিবর্তন অনুযায়ী গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংকলনকে পরিবর্তিত করে রাখা দরকার।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংকলন করাই কেবল গ্রন্থাগারিকের কাজ নয়। সংকলিত পুস্তক থেকে অকেজো বইগুলিকে বাতিল করাও গ্রন্থাগারিকের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। বিশেষ করে স্কুলের গ্রন্থাগার থেকে মাঝে মাঝে বই ছাঁটাই করা একান্ত প্রয়োজন। কলেজে নানা বিষয়ে গবেষণা চলতে পারে, সেজন্যে কখন কোন্ বইখানি গবেষকের প্রয়োজন হবে বা কোন্ বই কাজে লাগবে না, তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু স্কুলের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সেদিক থেকে কোন সমস্যা ওঠে না, ফলে স্কুলের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পুস্তক ছাঁটাইয়ের কাজটায় কোন সমস্যা নেই।

সাধারণতঃ যেসব বই নোংরা হয়ে গেছে বা যেসব বইয়ের পাতা ছিঁড়ে গেছে সেসব বই গ্রন্থাগারে রাখার কোন মানে হয় না। পুস্তকের রূপগত কারণ ও পুস্তকের বিষয়বস্তু এ দুটি বিষয় বিচার করে পুস্তক ছাঁটাই করতে হয়। বই ছিঁড়ে গেলে তা বাঁধাবার জন্যে গ্রন্থাগার থেকে বার করে নিতে হয়। তবে

বইখানি বাঁধিয়ে গ্রন্থাগারে রাখা হবে কি না, বাঁধাতে দেবার পূর্বে তা চিন্তা করে দেখা দরকার। যখন বইখানি কেনা হয়েছিল তখন বইখানির বিষয়বস্তুর স্কুলের গ্রন্থাগারে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পরে তা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যেতে পারে—ফলে সেবই গ্রন্থাগারে রাখার জন্য নতুন করে বাঁধাই করা মানে অর্থের অপব্যয় করা। কিন্তু বইখানি ইতিহাসের বই হলে বা ঐতিহাসিক চরিত্রের বই হলে বিশেষ বিবেচনা করে তবে তা বাতিল করা দরকার। বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি নতুন সংস্করণের কয়েকটি বিষয়ের উপর কিছু কিছু প্রবন্ধ কোন পুরনো সংস্করণের প্রবন্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ফলে বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে পুরনো সংস্করণ বাতিল না করাই ভালো।

স্কুলের গ্রন্থাগারে শিশুদের আকৃষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্যে গ্রন্থাগারের পুস্তকের বাহিরের রূপ যাতে শিশুদের আকর্ষণ করার উপযোগী হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। বইয়ের ছাপা, বইয়ের ছবি এমন হওয়া দরকার যাতে ছাত্রেরা সহজে পড়তে ও সহজে বুঝতে পারে। বইয়ের বাঁধাই বহিরঙ্গ ইত্যাদি রঙচঙে মজবুত ও উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন।

স্কুলের গ্রন্থাগারে কেবল যে পাঠ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বই রাখতে হবে, এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। কেবল পড়ার আনন্দে পড়ার জন্যেও বই রাখা প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ছাত্রের পড়ার উপরে একটা নেশা হয়ে যায় একখানা গল্পের বই পড়ার পর থেকে। একবার বই পড়ার আনন্দ পেলে শিশু বা যুবক পড়ার আনন্দের জন্যে ক্রমশঃ নানা বই পড়তে চাইবে।

গল্পের বই বা উপন্যাস স্কুলের গ্রন্থাগারে একটা সমস্যা। দুর্নীতিপূর্ণ গল্পের বই নিয়েই যত কিছু সমস্যা, কারণ কোন্ বই দুর্নীতিপূর্ণ, কোন্ বই সুনীতিপূর্ণ তা ঠিক করবে কে?

উপন্যাস ও গল্পের বইয়ের ক্ষেত্রে বেশি গোঁড়ামি ভালো নয়, কারণ মানুষের নীতিবোধ পরিবর্তনশীল। পনেরো বৎসর পূর্বে নীতি সম্বন্ধে মানুষের যা ধারণা ছিল, তার পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে যেসব বিষয় শিশুদের কাছে লুকিয়ে রাখা হত, সে-সব বিষয়ের উপর বই এখন তাদের পড়তে দেওয়া হয়। আমরা যে গল্প পড়ে আনন্দ পাই, স্কুলের ছাত্রদের আমরা সে গল্প পড়তে দিই না। আমাদের ধারণা, ছাত্ররা কেবল শিক্ষার জন্যই বই পড়বে। কিন্তু কোন্ বইখানি ছাত্রের পক্ষে সত্যই ক্ষতিকর বা কোন্ বইখানি পড়ে তার কোনই লাভ হবে না, এ দুটি বিষয় ঠিক করা খুবই কঠিন।

কিন্তু কেবল আনন্দের জন্যে পড়তে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হবে না, এ ধারণার অনুকূলে সত্যই কি কোন কারণ আছে? এ মতের অনুকূলে সত্যই যদি কোন কারণ না থাকে তা হলে কোন্ বইখানি সত্যই আনন্দদায়ক আর কোন্ বইখানি আনন্দদায়ক নয় তা কে ঠিক করবে? কিন্তু আসল কথা হচ্ছে স্কুলের গ্রন্থাগারে উপন্যাস ও গল্প বা Adventure-এর বই রাখা হবে কিনা। অনেকে বলেন, এ ধরনের বই ছাত্রদের পড়তে দেওয়া উচিত নয়। সেরূপ কোন ব্যক্তি যদি স্কুলের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হন, তা হলে তাঁকে সকল প্রকারের এবং সকল লেখকের বই-ই গ্রন্থাগার থেকে বাদ দিতে হবে। ফলে নাম-করা লেখকের বইও বাদ পড়বে, কারণ গল্প বা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য আর যা-ই হোক, তার প্রধান চরিত্র হচ্ছে পাঠককে আনন্দ দেওয়া।

স্কুলের গ্রন্থাগারে ছাত্রদের নানা বিষয় পড়তে না দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তারা যখন স্কুলের গণ্ডির বাইরে যাবে তখন তাদের কেমন করে সেসব বই পড়তে বাধা দেওয়া যাবে? তারা বেতারে গল্প শুনবে, টেলিভিশনে ছবি দেখবে, পত্রিকায়, প্রচ্ছদপটে নগ্ননারীর ছবি দেখবে; কেবল তাই নয়, বাস্তব জীবনে তাদের আশে-পাশে অনেক কিছুই দেখবে। তবে আর তাদের স্কুলের গ্রন্থাগারের মধ্যে গল্প উপন্যাস পড়তে বাধা দেওয়ার কি কোন মানে থাকে?

তবে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে, ছাত্রের বাইরে যা খুশি পড়বার বা দেখবার যতই সুবিধা থাক, স্কুলে তাদের সে সুবিধা দিতে হবে, এ মতের অনুকূলেও সত্যি কোন যুক্তি নেই।

তবে এ কথা বলা যায় যে, গ্রন্থাগারিক যখন পুস্তক-নির্বাচনের জন্য দায়ী তখন তার পক্ষে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা বা নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কোন্ বই ভালো কোন্ বই মন্দ তা গ্রন্থাগারিককে সব সময়ে খোলা মনে বিচার করে দেখতে হবে।

কোন একখানি বই গ্রন্থাগারে রাখা হবে কি না হবে, তা ঠিক করতে গেলে প্রথমত বইখানির সহিত পুস্তক-নির্বাচকের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা চাই এবং দ্বিতীয়ত যার জন্যে বই রাখা হচ্ছে তার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। কিন্তু কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এই দুটি পরিচয় অর্জন করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারিকের কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও সকল বিষয় সম্বন্ধে যত বই বার হচ্ছে সে সব বইয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং পুস্তক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে যেভাবে এবং

যার কাছে থেকে সাহায্য পাওয়া সম্ভব সে ভাবে এবং তার কাছ থেকেই সাহায্য নিতে হবে।

ছাত্র ও শিক্ষক

শিক্ষকদের কাছ থেকে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহায্য আপনা থাকতেই আসবে, কারণ কি কলেজে কি স্কুলে বইয়ের প্রয়োজন শিক্ষক মহাশয়দেরই বেশি। তবে এ কথা আমি পূর্বেই বলেছি, কোন্ কোন্ বিষয় সম্বন্ধে কখন কোন্ বই বার হচ্ছে তা জানা এবং প্রত্যেক বইয়ের সমালোচনা পড়া শিক্ষক মহাশয়দের পক্ষে সম্ভব নয়; সেজন্যে কিছু পরিমাণ প্রস্তাব গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে শিক্ষক মহাশয়দের কাছে যাওয়া দরকার। কারণ কোন্ বিষয়ে কি বই বার হচ্ছে এবং কোন্ বইয়ের কি সমালোচনা বার হচ্ছে, তা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে জানার স্থবিধা অনেক। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের কাজ হবে নিজের কোন মতামত না দিয়ে বইগুলিকে কেবল শিক্ষক মহাশয়দের নজরে আনা।

ছাত্র

গ্রন্থাগারে বই রাখা হয় ছাত্রদের পড়বার জন্যে। সে বই পড়বে, কোন্ বই তার ভালো লাগবে তা সে যত ভালো জানবে তা আর কেউ জানতে পারে না। অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে এবং পাঠ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বইয়ের ক্ষেত্রে ছাত্রের ব্যক্তিগত মতামতের কোন দাম নেই, কারণ এ দুই ক্ষেত্রে তাদের যা পড়তে দেওয়া হয় তাই তাদের পড়তে হবে। কিন্তু যেসব ছাত্র বই ভালোবাসে, যারা পড়তে চায়, তাদের কাছে প্রস্তাব করবার মত পুস্তকের সন্ধান সব সময়েই থাকে। স্থতরাং ছাত্ররা যাতে তাদের প্রস্তাব গ্রন্থাগারিকের কাছে পেশ করে, সে বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করা দরকার। পুস্তকের প্রস্তাবে উৎসাহিত করার ফলে ছাত্ররা নতুন পুস্তকের সন্ধান রাখবার চেষ্টা করবে। কেবল তাই নয়, এতে তাদের আত্মগরিমাকেও সন্তুষ্ট করা হয়, ফলে তারা স্কুল বা কলেজের পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে ছাত্রদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ফলে ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থাগারিকের ছাত্রদের জানবার স্থযোগ হয়।

জনসাধারণের গ্রন্থাগার

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সহিত স্কুলের গ্রন্থাগারিকের সম্বন্ধটা সব সময়ে বন্ধুত্বের হওয়া দরকার। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ ছোট ছেলেদের পড়বার জন্যে বইয়ের একটি আলাদা বিভাগ থাকে। সেই বিভাগে কি কি বই আছে

তা গ্রন্থাগারিকের জানা প্রয়োজন, কারণ অনেক সময়ে স্কুলের গ্রন্থাগারে যে-সব বই থাকে না সেসব বই পড়বার জন্যে ছাত্রদের জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পাঠান যেতে পারে। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে পড়ার মত বই কেনা হলেই তা স্কুলের গ্রন্থাগারিকের একবার দেখে আসা দরকার। কোন বই সম্বন্ধে জনসাধারণের গ্রন্থাগারিকের মতামত নেওয়া স্কুলের গ্রন্থাগারিকের পক্ষে মোটেই অন্যায় নয়।

অনুসন্ধানের বই

পাঠ্য পুস্তক এবং সাধারণ বই কেনা ব্যতীত স্কুলে ও কলেজে অনুসন্ধানের কাজের জন্যে নানা ধরনের অনুসন্ধান পুস্তক রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তারা এসব বই সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে গ্রন্থাগারিককে মহামুশকিলে পড়তে হয়, কারণ এই জাতীয় বই ছাত্রদের ছোটখাটো প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকের সন্ধান জানবার জন্যে গ্রন্থাগারে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এইসব পুস্তকের সাহায্যেই গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের ভিত গড়ে ওঠে।

পুস্তক-সম্ভারের ভিত্তি

স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংকলনের ভিত্তি হবে এইরূপ :

১। অনুসন্ধানের জন্য সাধারণ বই : বিশ্বকোষ, অভিধান, বর্ষপঞ্জী, জাতীয় পুস্তক তালিকা ইত্যাদি।

২। পাঠ্য সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ বিষয়ের অনুসন্ধানের বই।

এ ছাড়া :—

(ক) সাধারণ বই যা স্কুল বা কলেজের পাঠের কোন বিশেষ বিষয়ের বই নয়।

(খ) পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধীয় বই :—

১। কোন পাঠ্যবিষয়ের সমুদয় ক্ষেত্রের উপর লেখা বই।

২। পাঠ্যবিষয়ের কোন বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বা পাঠ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আর কোন বিষয়ের বই।

৩। পাঠ্য নয় অথচ প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের বই।

৪। ছাত্রদের বাড়তি সময়ে পড়বার মত বই।

বই কেনবার জন্য অর্থ ও বই কেনা

বই কেনবার জন্য অর্থ দুইভাবে ধার্য করা চলে : বিষয় শীর্ষে অর্থ ধার্য করা চলে না হয় বই কেনবার জন্য সাধারণ খাতে অর্থ ধার্য করা চলে। কিন্তু অর্থ

যে ভাবেই ধার্য করা হক, পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে তা ব্যয় হওয়া চাই তা না হলে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের ভিত্তি কোন কালেই গড়ে উঠবে না। কোন বিষয়ে প্রয়োজনের অধিক বই সংকলিত হবে, না হয় কোন বিষয়ের প্রয়োজন মেটাবার মত বই থাকবে না। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অর্থ ধার্য করা যেমন কঠিন তেমনি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করাও সমস্যাজনক।

একটি খাতে যখন সমুদয় অর্থ ধার্য করা হয় তখন অর্থ খরচ করার ভার সাধারণতঃ গ্রন্থাগারিকের উপর থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ের খাতে যখন অর্থ ধার্য করা হয় তখন গ্রন্থাগারিকের কাজ হয় কেবল বই কেনা কারণ টাকা খরচ করার ভার বিভাগীয় শিক্ষকের উপর থাকে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলি উঠতে পারে:

১। প্রত্যেক বিষয় শীর্ষে কত টাকা ধার্য করা হবে?

২। কিসের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ ধার্য করা হবে?

৩। ছাত্রদের সংখ্যার ভিত্তিতে না শিক্ষকের সংখ্যার ভিত্তিতে?

৪। কলেজে গবেষকদের ছাত্রসংখ্যা ভুক্ত করা হবে কি না?

৫। আগের বছরে যে টাকা কোন একটি বিষয়ের খাতে ধার্য করা হয়েছে, সেই টাকার পরিমাণই কি পরের বছরের অর্থের ভিত্তি হবে?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যদি উপরি উক্ত প্রশ্নগুলিকে বিচার করে দেখা যায় তাহলে আমরা প্রত্যেক প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পেয়ে যেতে পারি। আমরা পূর্বেই বলেছি স্কুল বা কলেজের উদ্দেশ্য পাঠ্য অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া এবং ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের বই পড়বার সুযোগ দেওয়া। এ দুটি উদ্দেশ্য কি ভাবে সফল করতে পারা যায় তা সহজেই বোঝা যায় যদি প্রতি বৎসরের গ্রন্থনির্গমনের একটি হিসাব পুস্তকের শ্রেণী বিভাগের কোন তালিকা অনুযায়ী রাখা হয়। প্রত্যেক বৎসরের প্রত্যেক বিষয়ের পুস্তক নির্গমনের একটি তুলনামূলক হিসাব রাখা হলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে কোন্ বিষয়ের পুস্তকের চাহিদার পরিমাণ কত। নতুন বছরে, বিশেষ কোন কল্পনাতীত ঘটনা যদি না ঘটে, তা হলে পুস্তকের চাহিদা আগের বছরের মত হবে তা ধরে নিতে পারা যায় এবং সেই চাহিদা অনুপাতে অর্থ ধার্য করলে চাহিদা মেটাবার কোনই অসুবিধা হবে না। প্রতি বছরে ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে পারে কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না কারণ স্কুল কলেজে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় একরূপ নির্ধারণ করা থাকে। কেবলমাত্র

অভূতপূর্ব কোন অর্থনৈতিক কারণের জন্য কোন রাষ্ট্রীয় ঘটনার দরুন এক দেশ থেকে আর এক দেশে বহুলোকের সমাগম হতে পারে। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ স্কুল কলেজের ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। এরূপ কোন ঘটনা ঘটলে পরিপূরক হিসাবে অর্থ ধার্য করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই।

যেসব কলেজে গবেষণার কাজ হয় সে সব কলেজে প্রতি বছরেই গবেষণায় সাহায্যকারী বই কেনবার জন্য আলাদা করে টাকা ধার্য করা প্রয়োজন। এ অর্থের ভিত্তি কি হবে তা ঠিক করা বিশেষ সমস্যাজনক নয় কারণ কি কি বিষয়ে গবেষণা হবে তা আগে থাকতেই ঠিক হয়ে থাকে।

এক একটি বিষয়ের উপর বাৎসরিক কত বই ছেপে বার হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করেও সেই বিষয়ের জন্য কত টাকা প্রয়োজন হবে তা ঠিক করা যায়। সারা পৃথিবীতে কত বই ছেপে বার হচ্ছে এবং স্কুলের ও কলেজের প্রয়োজনীয় বইয়ের সংখ্যা কত তা ঠিক করে নিয়ে এক একটি বিষয়ের বাৎসরিক পুস্তক সংখ্যা কত তা ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। পুস্তকের মূল্যও পুস্তকের ধার্য করা টাকার উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করবে। যেমন ধরুন বিজ্ঞান বিষয়ে ছাপা বইয়ের মূল্য অন্য কোন বিষয়ের পুস্তকের মূল্য অপেক্ষা বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছাত্র সংখ্যাই অর্থ-ধার্যের চূড়ান্ত ভিত্তি নয়।

বিষয়ানুযায়ী অর্থ ঠিক মত ধার্য করতে গেলে আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে: "এই বইগুলি আমরা কিনব, বইগুলির দাম কত হবে?", "আমরা এই টাকা ব্যয় করব, এই টাকায় কি কি বই কেনা যাবে?" এরূপ প্রশ্নের ঠিক মত উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নেমে দেখা যায় সাধারণ বই কেনবার জন্যে প্রতি বছর যে টাকা ধার্য করা হয় তাতে প্রয়োজন মোটেই মেটে না। ফলে আগের বছরের ধার্য টাকাকে পরের বছরের অর্থের ভিত্তি বলে ধরে নেওয়া যায় না কারণ আগের বছরের ধার্য টাকা যথেষ্ট না হলে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্ভার এমন ভাবে পিছিয়ে পড়বে যে তা আর কোন কালেই সম্পূরণ করা সম্ভব হবে না। আবার আগের বছরের অর্থ যদি প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশি হয় তাহলে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারে এত বেশি অকেজো বই এসে যাবে যে, বই ছাঁটাই করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। প্রয়োজনের অধিক অর্থ ধার্য হলে বছরের শেষের দিকে তা খরচ করতে হবে ফলে তখন বাচবিচার করে আর বই কেনা সম্ভব হবে না। সুতরাং হাতের কাছে যে বই কিনতে পাওয়া যাবে সেই বই-ই কিনতে হবে। এ ভাবে বই কেনায় কেবল যে ছাঁটাই করার সমস্যা বাড়ে তা নয় গ্রন্থাগারে স্থান সঙ্কুলানেরও অভাব হয়ে পড়ে।

উপরের বিষয়গুলি বিবেচনা করলে বোঝা যায়, যাতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ঠিক মত নির্ধারণ করতে পারা যায় সেদিকে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে এক একটি বিষয় শীর্ষে অর্থ ধার্য করা চলে কিন্তু এভাবে অর্থ ধার্য করায় অনেক বিরুদ্ধ মত আছে। প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে এক একটি বিষয়ের বিভাগীয় কর্তারা এক একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ হলেই যে কেবল প্রয়োজনীয় বইগুলি নির্বাচিত হবে এমন কোন মানে নেই কারণ ব্যক্তিগত আধিপত্য ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্ধারিত অর্থের উপর প্রভাব বিস্তার করবেই।

সমুদয় অর্থ বা নির্ধারিত অর্থের অধিকাংশ খরচ করবার ভার শিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকলে কাজের অনেক সুবিধা হয় সত্য কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে যে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের বিষয়গত ক্ষমতা থাকে না। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে পুস্তক নির্বাচন নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর এবং ব্যক্তিগত পারদর্শিতার উপর।

বিষয় শীর্ষে অর্থ নির্ধারণ করার দোষ-গুণগুলি হচ্ছে :—

গুণ :—

১। বিষয়ের বিভাগীয় কর্তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হবার সুযোগ থাকে না।

২। অকেজো বই কেনার জন্যে গ্রন্থাগারিককে দায়ী হতে হয় না।

৩। যথেষ্ট পরিমাণে টাকা ধার্য হলে বিভাগীয় কর্তাদের পুস্তক নির্বাচন কার্যে উৎসাহ থাকে। তাদের নিজস্ব বিভাগীয় অর্থ হিসাবে, অর্থ যাতে অন্যায় ভাবে খরচ না হয় সে দিকে লক্ষ্য থাকে।

৪। কোন বিভাগের প্রয়োজন কত সে খোঁজ নিয়ে অর্থ ধার্য করলে কোন বিভাগীয় কর্তার ভিত্তিহীন চাহিদা উঠতে পারে না।

দোষ :—

১। অর্থ অন্যায় ভাবে খরচ হতে পারে।

২। কোন একটি বিভাগের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ধার্য হতে পারে; আবার কোন একটি বিভাগের যতটা প্রয়োজন তা অপেক্ষা অনেক কম টাকা ধার্য হতে পারে।

৩। কোন একটি বিশেষ নিয়মানুসারে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভার গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

৪। হিসাব রাখার জটিলতা বাড়ে।

৫। একই অর্থ বছরের পর বছর ধার্য হতে থাকে। হঠাৎ পাঠ্য-তালিকার পরিবর্তন হলে বাড়তি অর্থ পাওয়া সম্ভব হয় না কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে কোন বিভাগের টাকা কমাতে গেলে ভীষণ আপত্তি ওঠে।

কার্যত না হলেও আমরা এ-কথা বলতে পারি যে সমুদয় অর্থ ব্যয়ের ভার গ্রন্থাগারিকের উপর থাকলেই ভালো হয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ সকল বিভাগীয় প্রয়োজন মেটাবার মত হওয়া চাই। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের দোষ-গুণ ও দুর্বলতা যতটা ভালো ভাবে জানবে, তত ভালো ভাবে আর কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয় কারণ গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের সহিত সম্বন্ধ সব সময়েই ঘনিষ্ঠ।

পুস্তক সংকলনের শেষ সমস্যা হচ্ছে গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তক রাখা হবে কি না এবং ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হবে কি না। এতক্ষণ আমরা যে সকল কথা বললাম তা কেবল পাঠ্য তৈরি করবার জন্য পুস্তক ও সাধারণ ও অনুসন্ধানের জন্য পুস্তকের কথা। স্কুলে পাঠ্য পুস্তক কেনার কোন মানে হয় না এবং স্কুলের সকল ছাত্রকে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করাও সম্ভব নয়। ছাত্রদের নিজের নিজের পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করবার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কলেজ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। পরীক্ষায় পাস করবার জন্য ছাত্রদের কাছে পাঠ্য পুস্তক সব সময়ে থাকা প্রয়োজন। কলেজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ের বইগুলির দাম সাধারণতঃ বেশি হয়। অনেক সময় বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে সব বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে জন্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পাঠ্য পুস্তক অন্তত কলেজের গ্রন্থাগারে কিছু রাখা প্রয়োজন।

মাসিক পত্রিকা বা সাময়িক পত্রিকা কেনাও স্কুল বা কলেজের পক্ষে একটা সমস্যা। কলেজের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেসব কলেজে গবেষণার কাজ হয় সেসব কলেজে মাসিক পত্র সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন কারণ কোন বিষয় সম্বন্ধে নতুন মতামত পুস্তকাকারে বার হবার বহু পূর্বে তা পত্রিকায় ছেপে বার হয়। গবেষণার কাজে পত্রিকার প্রয়োজন খুব বেশি। সে জন্যে দেখা যায় বই কেনবার জন্য নির্ধারিত অর্থের প্রায় ত্রিশ ভাগ সাময়িক পত্রিকা কেনবার জন্য খরচ হয়ে যায়। স্কুলে এ-ধরনের সমস্যা ওঠে না কারণ সেখানে গবেষণার কাজ হয় না।

কোন পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কেনবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা কোন কলেজের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। কোন পত্রিকায় প্রকাশিত কোন একটি

প্রবন্ধের প্রয়োজন হয় সাধারণতঃ ক্ষণিকের জন্য। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন গ্রন্থাগার থেকে পত্রিকা আনিয়ে প্রয়োজন মেটান যেতে পারে। আজকাল কোন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা পাওয়া যায়। সেই সব তালিকা থেকে সহজেই জানতে পারা যায় কোন্ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় পত্রিকা পাওয়া যাবে।

বই কেনা

বই কেনার হিসাব কিভাবে রাখতে হবে তা আগে থাকতে ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। হিসাব দু ভাবে রাখা যেতে পারে খাতায় ও কার্ডের উপর। গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ কার্ডের উপর বই কেনার হিসাব রাখা হয় তার কারণ কার্ডের উপর হিসাব রাখায় সুবিধা অনেক। প্রধান সুবিধা হচ্ছে কার্ডগুলি ইচ্ছামত সরান যায় এবং যখন খুশি যথাস্থানে নূতন কার্ড রাখা যায়। এ-ছাড়া কার্ডের বহু সুবিধা আছে। পরে আমরা কার্ডের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে বলব।

বই কেনা এবং তার হিসাব রাখা এমন কিছু একটা সমস্যাজনক ব্যাপার নয়। তবে মনে রাখতে হবে, যে উপায়েই বই কেনার হিসাব রাখা হক, কোন বই সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান এলে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেওয়া সম্ভব হওয়া চাই। কোন বই সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব খোঁজ আসে সেগুলি হলো :—

১। কোন্ বিষয়ে কি কি বই প্রস্তাবিত হয়েছে।

২। প্রত্যেক বইয়ের বিবরণ : লেখক ও বইয়ের নাম।

৩। কোন্ বিষয়ে কত টাকা ধার্য করা আছে। কত টাকা খরচ হয়েছে। কত টাকা খরচ করতে বাকি আছে।

৪। কার কাছ থেকে কোন্ বই কেনা হবে এবং কার কাছ থেকে কোন্ বই কেনা হয়েছে।

৫। বই কবে আন্দাজ গ্রন্থাগারে আসবে? কবে গ্রন্থাগারে বই এসেছে?

৬। যে সব বই গ্রন্থাগারে এসেছে সে সব বইয়ের "bill" গ্রন্থাগারে কবে এসেছে?

৭। কোন্ তারিখে মূল্য দেওয়া হয়েছে?

৮। কোন্ কোন্ বই "দেখে" নেবার জন্যে এসেছে?

৯। কত টাকার "অর্ডার" দেওয়া হয়েছে?

এই সব প্রশ্নের কোন একটি প্রশ্ন উঠলে তার যথাযথ উত্তর দিতে পারলেই বুঝতে হবে বই কেনার হিসাব রাখার যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার ভিতরে কোন ত্রুটি নেই। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে গেলে নিম্নলিখিত ভাবে কার্ড ছাপিয়ে রাখতে হবে।

বিষয়.................................. ধার্য অর্থ..............................
সরবরাহকারীর নাম .... ঠিকানা ....

পুস্তকের নাম .... লেখক..........................
মূল্য.. .... সংস্করণ...................... তালিকামূল্য............
খরিদ মূল্য....................কবে বই এসেছে ....

তালিকাভুক্তি........... গ্রন্থাগার ভুক্তি............জাতিবিচার............
মঞ্চভুক্তি............................ ....কে দেখে নিয়েছে....................

প্রস্তাবকারীর নাম.....................পুস্তক পরিচয়.......................

বাকি সন্ধানগুলি যেমন "কবে বিল এসেছে" "কবে বিলের টাকা দেওয়া হল" ইত্যাদি কার্ডের অন্য পিঠে রাখতে হবে।

কার্ডের মাপ হবে ৫" × ৩" এবং কার্ডের নিচের দিকে থাকবে একটি ছিদ্র। এই ছিদ্রের অর্থ হচ্ছে কার্ডগুলিকে রডের সাহায্যে ট্রের ভিতর আটকে রাখা।

অন্য প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে একটি বা দুটি ট্রে না হয় প্রত্যেক বিষয়ের একটি করে ট্রেযুক্ত একটি দেরাজ। ট্রের ভিতর আটটি করে খাপ থাকবে, না হয় প্রত্যেক ট্রের জন্য আটখানি পরিচালক পত্র থাকবে। পরিচালক পত্রে ছাপা থাকবে:

১। কমিটির জন্য
২। অনুমোদিত
৩। কিনিতে দেওয়া হল
৪। পুস্তক প্রবেশ বা গ্রন্থাগার ভুক্তি
৫। জাতি বিচার
৬। তালিকা প্রস্তুত

৭। ছাপা নাই

৮। বাতিল

প্রস্তাবিত পুস্তকের কার্ডগুলি "কমিটির জন্য" খাপের মধ্যে রাখা হল। যে সকল বই কেনবার জন্য কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হল সে কার্ডগুলি প্রথম খাপ থেকে বার করে নিয়ে "অনুমোদিত" খাপে রাখা হল। এমনি ভাবে বই কেনার কাজ যেমন যেমন এগুতে থাকবে, কার্ডগুলিকে ক্রমশঃ একটি খাপ থেকে আর একটি খাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক বইয়ের দুইখানি করে কার্ড করতে পারলে কাজের সুবিধা হয় অনেক। বইয়ের অর্ডার দেবার সময় প্রত্যেক বইয়ের কার্ড সরবরাহকারীর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারা যায় এবং সেই সঙ্গে তাকে একটি পত্রের দ্বারা জানাতে হয় বই সরবরাহ করবার সময় প্রত্যেক বই কার্ড সমেত পাঠাতে।

এবার বই আসতে শুরু হল। বই আসার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ভিতরের কার্ডগুলি তৃতীয় খাপে রাখা কার্ডগুলির সহিত মিলিয়ে নিয়ে ও বইগুলিকে কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দুইখানি কার্ডেই পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও নম্বর লিখে নিয়ে তৃতীয় খাপের কার্ডগুলি চতুর্থ খাপে রেখে অন্য কার্ডগুলি সমেত বইগুলি পুস্তকের জাতি বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বইয়ের সহিত যে কার্ডগুলি ফেরত আসছে সে কার্ডগুলি একটি ট্রেতে, পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন। এই কার্ডগুলিতে জাতি বিচারের সংখ্যা পড়বার পর পুস্তক প্রবেশের হিসাব হিসাবে গণ্য হবে। বাকি কার্ডগুলি তালিকা প্রস্তুত-কারকের কাছ থেকে ক্রমশঃ মঞ্চভুক্তি পর্যন্ত এগিয়ে যাবে এবং পরে সেগুলি মঞ্চ তালিকা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বই কেনার কাজ এভাবে করা হলে প্রত্যেক বইয়ের প্রস্তাব থেকে আরম্ভ করে পুস্তকের মঞ্চভুক্তি পর্যন্ত সমুদয় সংবাদ মঞ্চ তালিকায় থেকে যাবে এবং পুস্তক প্রবেশের তালিকায় উপরন্তু বইয়ের বিল আসা ও বিল মেটানর সংবাদ সম্বলিত হবে, ফলে একখানি বইয়ের প্রস্তাব থেকে মঞ্চভুক্তি পর্যন্ত যে কোন সংবাদ অনায়াসে দেওয়া সম্ভব হবে।

পুস্তক প্রবেশের তালিকাঃ আমরা বলেছি পুস্তক প্রবেশের তালিকা কার্ডে রাখায় অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু অনেকে তা পছন্দ করে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ-তালিকা খাতাতেই রাখা হয়। পুস্তক প্রবেশের ছাপা খাতার নমুনা (পরপৃষ্ঠায়):--

দৈনন্দিন পুস্তকাগমনের তালিকা

খাতা

১

তারিখ	ক্রমিক সংখ্যা	লেখকের নাম	বইয়ের নাম ও সংস্করণ	প্রকাশক	প্রকাশের তারিখ

খাতার বামদিকে থাকবে।

২

বিক্রেতা বা দাতার নাম	প্রঃ মূল্য	ক্রয় মূল্য	বিলের নম্বর ও তারিখ	ডাঃ সংখ্যা	খণ্ড	মন্তব্য

খাতার ডান দিকে থাকবে।

এই তালিকায় শেষ বইখানির সংখ্যা দেখে বলা যায় গ্রন্থাগারে শেষ তারিখ পর্যন্ত কত বই এসেছে কিন্তু এই সংখ্যাই যে গ্রন্থাগারের মজুত বইয়ের সংখ্যা তা যেন কেউ মনে না করেন কারণ গ্রন্থাগার থেকে অনেক বই বাতিল করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রত্যেক বইখানি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলে পর প্রত্যেক বইয়ের ভিতরে কোন স্থানে পুস্তক প্রবেশের সংখ্যা লিখে রাখতে হয়। এই সংখ্যার উদ্দেশ্য কোন একখানি বইকে সনাক্ত করা।

খাতার আকারে এই তালিকা রাখা হলে যে সকল সংখ্যার বই বাতিল করা হয় সেই সংখ্যাগুলি খালি পড়ে থাকে। কিন্তু কার্ডে এ তালিকা রাখায় লাভ হচ্ছে এই যে কোন একখানি বই বাতিল করা হলে সেই বইখানির কার্ড বার করে নিয়ে বাতিল করা বইয়ের হিসাবের ট্রেতে রাখতে পারা যায়। খাতায় পুস্তক প্রবেশের হিসাব রাখা হলে যে বইগুলি বছরের পর বছর বাতিল করা হয় সেই বাতিল করা সংখ্যাগুলি খালি পড়ে থাকে এবং ক্রমশঃ এই সংখ্যার সংখ্যা বাড়তে থাকে, কিছুদিন পরে হাজার হাজার সংখ্যা খালি পড়ে থাকতে পারে। সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে একটি সংখ্যা দুইবার ব্যবহার করতে নেই। কিন্তু ব্যবহার করায় দোষ কি? নতুন বইয়ের কার্ডে পুরনো সংখ্যা দেওয়া হল এইটুকু লিখে রাখলেই কাজ মিটে যায়। এবং বাতিল .বইয়ের কার্ডে সেই সংখ্যা যে অন্য বইয়ে দেওয়া হল সে উল্লেখ থাকলেই যথেষ্ট।

বই কেনার হিসাব কি ভাবে রাখলে কাজের সুবিধা হয় তা বলা হল। এখন ঠিক করা দরকার বই কার কাছ থেকে কেনা হবে। বই প্রকাশকের কাছ থেকে কেনা যেতে পারে, স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে কেনা যেতে পারে, বা বিদেশীয় বই বিদেশ থেকে আনিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

প্রকাশক ঃ প্রকাশকের কাছ থেকে বই কিনলে বেশি ব্যাজ পাওয়া যায় কিন্তু প্রকাশক বিদেশীয় হলে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ বই এসে পৌছাতে অনেক দেরি হয়, বইয়ের অর্ডার পাঠানো ও বই পাঠানোর খরচা বেশি পড়ে ফলে বই কেনার খরচ বেড়ে যায়। তার উপর বিদেশ থেকে বই আমদানি করার নানাবিধ বাঁধা ধরা আইন আছে। এই সব কারণে বিদেশী প্রকাশকের কাছ থেকে সোজাসুজি বই না কেনাই ভালো। দেশী প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কেনায় কোন বাধা নেই উপরন্তু সুবিধাই বেশি। সুবিধাগুলি হল :—

১। বই "দেখে" নেবার জন্য তাদের কাছ থেকে বই আনা যায়।

২। তাড়াতাড়ি প্রয়োজন এমন বই তাদের কাছ থেকে কেনা চলে।

৩। পুস্তক প্রকাশের পূর্বে তাদের কাছে আবেদন দেওয়া চলে।

৪। যে সব বই কেবলমাত্র প্রকাশকের কাছ থেকে পাওয়া যায় সে সব বই প্রকাশকের কাছ থেকে কিনতেই হবে।

পুস্তক বিক্রেতা বা প্রতিনিধি

এদের কাছ থেকে বই কেনা স্থবিধাজনক। পুস্তক বিক্রেতারা বা কোন প্রকাশকের প্রতিনিধি পুস্তকের মূল্যের উপর যে ব্যাজ দেয় তা বড় কম নয়। অবশ্য বই কেনার পরিমাণ বেশি না হলে তাদের পক্ষে মূল্যের উপর বেশি ব্যাজ দেওয়া সম্ভব হয় না।

কিন্তু পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে বই কেনার একটা প্রধান দোষ হচ্ছে, স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতারা, বা প্রকাশকের প্রতিনিধিরা গ্রন্থাগারিকের উপর কিংবা যাদের উপর বই কেনার ভার আছে তাদের উপর নানা উপায়ে অন্যায় ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ফলে তাদের অনেক পুরনো ও অকেজো stock শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে চালিয়ে দিতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। তবে এ কথাও সত্যি যে গ্রন্থাগারিক বা যাদের উপর বই কেনার ভার আছে তারাও পুস্তক বিক্রেতার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের মাধ্যমে সাময়িক পত্র বা কোন পুস্তকের পরিপূরক ইত্যাদি আনিয়ে নিতে পারে।

স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতা

স্কুলের বইয়ের জন্য স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে বই কিনতে পারা যায় এবং প্রয়োজন হলে তাদের বইয়ের অর্ডার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কলেজের বইয়ের জন্য স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতাকে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। অবশ্য স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতার stock যদি যথেষ্ট পরিমাণ হয় এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি তার যথেষ্ট স্থনাম থাকে তাহলে তাদের কাছ থেকে বই কেনার কোন অস্থবিধা হয় না। তবে একথা মানতেই হবে যে স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতা পুস্তকের মূল্যের উপর বেশি ব্যাজ দিতে পারে না।

কাকে কোন্ বই অর্ডার দেওয়া হবে তা ঠিক করা হলে, সরবরাহকারীর নাম "অর্ডার কার্ডের" উপর লিখতে হবে। অর্ডারের ট্রেতে "বই কিনতে দেওয়া হল" শীর্ষে যে খাপ আছে সেই খাপটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারলে ভালো

হয়। একটি খাপে থাকবে স্থানীয় সরবরাহকারীকে যে সব বইয়ের অর্ডার দেওয়া হল সেই সব বইয়ের কার্ডগুলি, আর একটি খাপে থাকে বাহিরে যে বইগুলির অর্ডার দেওয়া হল সেই বইয়ের কার্ডগুলি।

শেষ যে বই এলো না বা ছাপা না থাকার দরুন বই পাওয়া গেল না সেই বইয়ের কার্ডগুলি "বই ছাপা নাই" ও "বাতিল" এই দুটি খাপে রেখে দিতে হবে।

ধার্য অর্থ খরচের হিসাব

এই হিসাব রাখবার জন্য প্রত্যেক বিষয়ের কার্ডের সম্মুখে একখানি হিসাবের কার্ড রাখা যেতে পারে। এই কার্ডখানির বাম দিকে থাকবে ধার্য টাকার পরিমাণ এবং ডান দিকে থাকবে খরচের পরিমাণ। খরচের স্থানে থাকবে দুটি স্তম্ভ। একটি স্তম্ভে থাকবে কত টাকার বিল প্রতিমাসে মেটান হচ্ছে এবং অন্য স্তম্ভে থাকবে কত টাকার বিল মেটাতে বাকি আছে। প্রত্যেক মাসের শেষে এই হিসাব রেখে যেতে হবে। এবং জমা টাকা থেকে খরচের টাকা বাদ দিলেই খরচ করবার আর কত টাকা জমা আছে তা জানা যাবে।

পত্রিকার হিসাব

সাধারণ ছোট-খাটো পুস্তকাগারে, যেখানে কয়েকখানা মাত্র পত্রিকা নেওয়া হয় সেখানে পত্রিকার হিসাব রাখা এমন কিছু একটা সমস্যা নয়, কিন্তু বড় বড় পুস্তকাগারে কিংবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাগারে পত্রিকার হিসাব রাখা একান্ত দরকার। কোন পত্রিকা যথা সময়ে এলো কিনা, না আসার জন্য প্রকাশককে পত্র লেখা, কোন্ পত্রিকার কত খণ্ড আছে, কোন্ খণ্ড নাই, এ সমুদয় সংবাদ নখ-দর্পণে থাকা চাই।

পত্রিকার হিসাব রাখবার জন্য প্রয়োজন পরবর্তী পৃষ্ঠায় নমুনা অনুযায়ী ছাপা কার্ড (৫" × ৩") আর একটি ট্রে। প্রত্যেক কার্ডে নমুনা অনুযায়ী পত্রিকার বিবরণ লেখা থাকবে। দৈনিকের কার্ডগুলি ট্রের "দৈনিকের" খাপে, সাপ্তাহিক "সপ্তাহিকে"র খাপে থাকবে ইত্যাদি।

দৈনিকের বেলা কার্ডের ঘরগুলির উপর নিচে ব্যবহার করুন এবং প্রতিদিন যেমন পত্রিকা পাচ্ছেন একটি করে × চিহ্ন দিন।

দৈনিক পত্রিকার দুই বৎসরের হিসাব একখানি কার্ডের উপর রাখা যাবে।

সাপ্তাহিকের বেলায় ঘরগুলি আড়াআড়ি ভাবে ব্যবহার করুন।

পত্রিকার নাম	প্রকাশ-কাল	
প্রঃ তারিখ	মূল্য	প্রকাশক
বৈশাখ—চৈত্র	সূচী......	

	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩
জানুয়ারী	দৈ	নি	ক	
ফেব্রুয়ারী				
মার্চ				
এপ্রিল	× × সা × ×			
মে	× × প্রা × ×	মা ×		
জুন	× × হি × ×	সি ×		
জুলাই	× × ক × ×	ক ×		
আগস্ট		প ×		
সেপ্টেম্বর		ত্রি ×		
অক্টোবর		কা ×		
নভেম্বর				
ডিসেম্বর				

৫"×৩"

মাসিক পত্রিকার বেলা প্রতি ঘরে একটি করে × দিয়ে দেওয়া মাত্র কাজ।

যে দিনের, যে সপ্তাহের ও যে মাসের পত্রিকা এলো না, সেই পত্রিকার কার্ডখানি তুলে নিয়ে 'আসে নাই' ঘরে রাখুন এবং প্রকাশককে তাগিদপত্র দিন।

প্রতিদিন সকালে এসে একবার করে পত্রিকার ট্রে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, কোন্ পত্রিকা আসতে বাকি আছে। মাসিক পত্রিকার খাপ দুটি, একটি ১ হতে ৭ তারিখের মধ্যে যে পত্রিকাগুলি আসে, আর একটি ১৬ হতে ২২ তারিখের মধ্যে যে-সব পত্রিকা আসে, আর একটি ২৩ হতে ৩১ তারিখের ঘর থাকলে ভালো হয়।

পত্রিকা পাবার আনুমানিক তারিখ কার্ডের উপর লেখা থাকবে এবং তারিখ অনুযায়ী কার্ডগুলি তারিখের খাপে থাকবে।

দান গ্রহণের দ্বারা পুস্তক সংগ্রহ

দান গ্রহণের দ্বারা বেশি পুস্তক সংগ্রহ হয় না সত্য, কিন্তু জনসাধারণের দান পুস্তকাগারে গ্রহণ করা বিশেষ একটি সমস্যা। সাধারণের কাছ থেকে দান গ্রহণের দ্বারা খুব বেশি মূল্যবান বই পাওয়া না গেলেও, জনসাধারণের কাছে দানের জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত, এবং তাদের দানে পুস্তকাগার যে বিশেষ উপকৃত হবে এ বিষয়েও জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু মনে রাখবেন, দান করার চেয়ে দান গ্রহণ করা অনেক সমস্যাজনক। সেই জন্যে দান গ্রহণ করা-না-করার ক্ষমতা গ্রন্থাগার-কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। দান করে অনেকে মনে করেন পুস্তকাগার সাধারণের কাছে দাতার নাম চিরস্মরণীয় করে দেবে, কিন্তু একথা তাঁরা ভুলে যান যে, বিংশ শতাব্দীর পুস্তকাগারে খুব কম বই চিরস্থায়ী হয়। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুস্তকের মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। যে বইয়ের কোন মূল্য নেই এমন বই আজকালকার পুস্তকাগারে রাখার মানে থাকে না।

বই কেনার সময় আমরা যে উপায় অবলম্বন করেছি, এখানেও ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করা দরকার। দান গ্রহণের দ্বারা যে-বইগুলি পুস্তকাগারে আসবে সেগুলির একখানি করে কার্ড লিখে ফেলুন। এ কার্ডগুলি রঙীন কার্ড হলে ভালো হয়, তাতে কার্ডগুলি দেখলেই বোঝা যাবে দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইয়ের কার্ড। ছোট-খাটো পুস্তকাগারে বই কেনার ট্রেই দান গ্রহণের ট্রে হিসাবে ব্যবহার করা চলে। বড় পুস্তকাগারে "দান গ্রহণের" একটি আলাদা ট্রে ব্যবহার করলে ভালো হয়।

"বই কেনা"র কার্ডগুলি যেমন এক এক ধাপ উঠে শেষ পর্যন্ত "দৈনন্দিন" পুস্তকাগমনের তালিকা হিসাবে ব্যবহার হয়, "দান গ্রহণের" কার্ডগুলিও ঠিক সেইরূপ ধাপে ধাপে উঠে শেষে পুস্তকাগমনের দৈনন্দিন তালিকা হিসাবে ব্যবহার হবে।

দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইগুলির জন্য গ্রন্থাগারে আলাদা কোন স্থান ঠিক না করাই ভালো। পুস্তকাগারের সাধারণ পুস্তক-সম্ভারের সঙ্গেই সে বইগুলিকে স্থান দেওয়া উচিত এবং সে বইগুলির আলাদা কোন তালিকা না করে সাধারণ তালিকা-ভুক্ত করা ভালো। তবে যে ক্ষেত্রে দান মূল্যবান এবং পুস্তকের সংখ্যা বেশি সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ দানের ও দাতার মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত।

বইয়ের যত্ন

পুস্তকাগারের আয়ের শতকরা সাত ভাগ বই বাঁধাই করতে খরচ হয়। পাঠকদের ও পুস্তকাগারের কর্মীদের গাফিলতির জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বইয়ের ক্ষতি হয়ে যায়, সেই কারণে পাঠকদের ও কর্মীদের বইয়ের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

বই খোলা ঃ প্রথম দুই হাতের অনামিকা ও মধ্যমার দ্বারা কয়েকখানি পাতা সমেত বইয়ের মলাট ধরে মলাট দুইখানিকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলুন। ঠিক সেই অবস্থায় বইখানি বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আর কিছু পাতা আলগা করে ধরুন। বইখানি আবার খুলুন—বইয়ের মাঝামাঝি এসে পড়লেই কাজ শেষ হল।

পাতা কাটা ঃ পাতা কাটবার জন্য খুব ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে নেই। প্লাস্টিকের বা হাড়ের বই-কাটা ছুরি ব্যবহার করা ভালো। পাতাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বইয়ের শিরদাঁড়া পর্যন্ত কাটবেন—একটুও যেন বাকি না থাকে। বইয়ের পাতা কাটবার জন্যে পাঠক যত্ন নেবে না, সম্মুখে যা পাবে তাই দিয়ে সে পাতা কাটবে।

পত্র-নির্দেশক ঃ বইয়ের পাতা মোড়া, পাতার কোণ মোড়া, দাঁতখোঁটার কাঠি পাতার মধ্যে রাখা পাঠকদের অভ্যাসগত দোষ।

"পাতা মুড়িবেন না" এ কথা পাঠকদের বলায় কোন লাভ নেই। পাঠকদের অভ্যাস দূর করতে গেলে তাদের অভাব দূর করতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে একটি করে পত্র-নির্দেশক দিতে হয়। প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে পত্র-নির্দেশক দেওয়া বিশেষ কিছু কষ্টকর নয়। প্রকাশকদের বিজ্ঞাপন-ছাপা পত্র-নির্দেশক প্রকাশকদের কাছ থেকে চাইলেই পাওয়া যায়।

মঞ্চ থেকে বই বার করা ঃ মঞ্চে খুব ঠেসে বই রাখতে নেই। ঠেসে বই রাখলে তাড়াতাড়ি বই বার করবার সময় বইয়ের পুটের বাঁধাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সময়ে সময়ে একখানি বই জোর করে টানার ফলে একেবারে অনেক বই নিচে পড়ে যেতে পারে। এ ভাবেও বই ছিঁড়ে যেতে পারে এবং বইয়ের সেলাই কমজোরী হয়ে যেতে পারে।

মঞ্চ থেকে বই বার করবার সময় তর্জনি বইয়ের উপরে কিছু ভিতর দিকে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার দ্বারা বইখানি ধরে টেনে বার করুন।

বই ধরবার নিয়ম : বই পড়ার সময় বই ঠিকমত ধরতে না জানলে বইয়ের সেলাই অনেক সময় কমজোরী হয়ে যায়, না-হয় বইয়ের আঠা ভেঙে গিয়ে বইয়ের পাতা খুলে আসে। বই পড়বার সময় বই কখনও পিছন দিকে উলটে দুটি মলাট একসঙ্গে করে ধরতে নেই, তাতে বইয়ের বাঁধাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ধুলা : বইয়ের ধুলা ঝাড়া একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ। মনে রাখবেন, ধুলা ঝাড়তে হয়, ঘসতে নাই। ধুলা ঝাড়বার জন্য ব্রাশ ব্যবহার করা ভালো। ঝাড়ন ব্যবহার করলে ধুলা বইয়ের পাতার ভিতরে ঢুকে যায়।

আর্দ্রতা : পুস্তক-মঞ্চ কখনও দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতে নেই। মঞ্চের পিছন দিকে হাওয়া যাতায়াত করবার যথেষ্ট স্থান থাকা দরকার। শেল্‌ফের নিচেকার থাক মাটি থেকে অন্তত ১½ ফুট উঁচু হওয়া চাই। আর্দ্রতা বইয়ের বাঁধাই, প্রচ্ছদপট, প্রচ্ছদপটের রং ও বইয়ের পাতার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

সংক্রামক ব্যাধি : পুস্তকের মাধ্যমে কোন সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে একথা স্বীকার করতেই হবে, তবে পুস্তকের মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে এরূপ কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত শোনা গেছে বলে মনে হয় না। অনেকে বলেন পুস্তকের মাধ্যমে ব্যাধির সংক্রামকতা বৃদ্ধি পায় না। বইয়ের উপর ঠিকমত আলোবাতাস লাগলে, বই নিয়মিতভাবে ঝাড়া ও পরিষ্কার করা হলে, পুস্তকের মাধ্যমে রোগ সংক্রামণ হতে পারে না।

কোন গ্রাহক কোন সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হলে তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারকে জানানো দরকার। গ্রাহক যতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সেই সংসার থেকে সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণভাবে যতদিন না অপসারিত হয় ততদিন সে সংসারে বই দেওয়া বন্ধ রাখতে হয়। স্বাস্থ্য-দপ্তরের ডাক্তারের certificate না পাওয়া পর্যন্ত বই দেওয়া বন্ধ রাখা প্রয়োজন।

যে-সব বই সংক্রামক ব্যাধির সংস্রবে এসেছে সে-সব বই যদি পুরনো বা অল্পদামী হয় তা হলে তা নষ্ট করে ফেলাই ভালো। অনেক সময় যে গ্রাহকের দ্বারা বইগুলি সংক্রামিত হয়েছে তার কাছ থেকে জরিমানা হিসাবে কিছু অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে।

রোগমুক্ত পাঠকের টিকিটখানি যদি পকেট-সমেত টিকিট হয় তা হলে তা নতুন করে করবার প্রয়োজন নেই, কারণ পাঠকের কাছে বই থাকায়, তার টিকিটখানি গ্রন্থাগারে থাকে সুতরাং তার টিকিটখানি সংক্রামিত হবার কারণ থাকে না। পকেট-বিহীন টিকিট নতুন করে নেওয়া দরকার।

ধোঁয়া ঃ মঞ্চের ঘরের ভিতর ধূমপান করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, তাতে অগ্নিভীতি অনেকটা দূর হয়। আর মনে রাখবেন, তামাকের ধোঁয়ায় বাঁধাই করা বইয়ের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

আলো ও উত্তাপ ঃ বইয়ের উপর সোজাসুজি ভাবে আলো পড়লে বইয়ের উপর উত্তাপ বেশি লাগে, তাতে বই বেঁকে যায় এবং বইয়ের নমনীয়তা ও রং খারাপ হয়ে যায়।

বইয়ের ঠেকনা ঃ আমরা আগেই বলেছি, শেল্‌ফে বেশি ঠেসে বই রাখতে নেই। অনেক সময় একখানি বই টেনে বার করতে গিয়ে শেল্‌ফ সুদ্ধ বই মাটিতে পড়ে যেতে পারে। নতুন বইকে স্থান দেবার জন্যে শেল্‌ফে সব সময় কিছু জায়গা রাখতে হয়। শেষের বইখানিকে খাড়া করে রাখবার জন্যে একটা ঠেকনা ব্যবহার করা দরকার।

বই সারা ঃ কোন পাতা ছিঁড়ে গেলে জোড়া দেওয়া, একটি ছবির প্লেট খুলে গেলে তা পুনরায় জোড়া দেওয়া, এই সব সামান্য কাজ পুস্তকাগারের কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলা দরকার।

বই বাঁধাই

বই বাঁধাই দপ্তরীর কাজ, কিন্তু যিনি বই বাঁধাতে দেবেন তাঁর বই বাঁধাই সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান চাই। কোন্ বইয়ের কিরূপ বাঁধাই হওয়া দরকার, নিদর্শন অনুযায়ী বাঁধান হল কি না, যুজ সেলাইয়ের জায়গায় ফুঁড়ে সেলাই করা হয়েছে কি না, এ সব বিষয় তাঁর জানা প্রয়োজন। পুস্তক বাঁধাই সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলবো না, কারণ পুস্তক বাঁধাই হচ্ছে পুস্তক-বিজ্ঞানের অঙ্গ। এখানে কেবল আমরা বলবো বই বাঁধতে দেওয়া ও তা ফেরত নেওয়ার হিসাব রাখার কথা।

বই বাঁধতে দেওয়ার সময় দপ্তরীকে জানিয়ে দিতে হয় কোন্ বইখানি কি রকম বাঁধাই হবে।

বই বাঁধাই করতে পাঠাবার আগে বইয়ের ভিতর হতে পুস্তকের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিয়ে একটি ট্রের ভিতর রাখুন।

প্রত্যেক বইয়ের জন্য পর পৃষ্ঠার নমুনা অনুযায়ী দুইখানি করে কার্ড করুন, একখানি বইয়ের সঙ্গে দপ্তরীকে দিয়ে দিন। আর যে কার্ডখানি নিজের কাছে রাখলেন, তার পিছনে দপ্তরীর বা তার প্রেরিত লোকের স্বাক্ষর করিয়ে নিন। পরে কার্ডগুলিকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী একটি ট্রের ভেতর সাজিয়ে রাখুন। বই

ফেরত এলে আপনার কাছে রাখা কার্ডের বিবরণের সহিত বই মিলিয়ে নিয়ে, বইয়ের ভিতর পুস্তক পরিচয়-পত্রখানি যথাস্থানে রেখে দিন। এবার বই মঞ্চে পাঠিয়ে দিতে পারেন। প্রতি বৎসরের শেষে বই বাঁধাই করতে কত খরচা হল তার হিসেব করা হলে বই বাঁধাইয়ের কার্ডগুলি নষ্ট করে ফেলতে পারেন।

বই বাঁধাইয়ের হিসাব রাখবার জন্য একটি ট্রে ও কতকগুলি নিম্নের নমুনা অনুযায়ী ছাপা কার্ড প্রয়োজন :—

৫" × ৩"

গ্রন্থাগারের নাম

ছাপার আদর্শ…………………	ক্রমিক নং…………………
রং…………………	শিরদাঁড়ার রং…………………
মূল্য…………………	তারিখ…………………

গ্রন্থাগারের নাম	৮৯১.৪৪৩ শ ২২২			শরৎচন্দ্র	শ্রীকান্ত

পুস্তক নির্গমনের তুলনামূলক হিসাব

কোন্ জাতীয় বই কত বার হচ্ছে তার একটা তুলনামূলক হিসাব প্রতি বৎসর করা প্রয়োজন। কোন্ জাতীয় বই কি রকম ব্যবহার হচ্ছে, কোন্ জাতীয় বই পুস্তকাগারে আরও বেশি রাখা দরকার, গ্রাহকের সংখ্যা অনুযায়ী বইয়ের চাহিদা হচ্ছে কি না, কোন্ বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, বইয়ের ব্যবহার অনুযায়ী পুস্তকাগারে কাজ হচ্ছে কি না, কর্মী কমানো বা বাড়ানো প্রয়োজন কি না, এ সব বিষয়ই পুস্তক নির্গমনের হিসাব থেকে বোঝা যায়। পুস্তক নির্গমনের হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আমরা পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছি।

প্রতি বৎসরে বই নির্গমনের হিসাব, গ্রাহকের হিসাব এবং পুস্তকাগারের কর্মীদের কাজের হিসাব ছাপিয়ে বার করা প্রয়োজন।

পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া

প্রতি বৎসর পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া দরকার। মঞ্চ-তালিকার সঙ্গে, মঞ্চে সঞ্চিত বই, নির্গত বইয়ের তালিকা ও যে-সকল বই বাঁধাই করতে দেওয়া হয়েছে তা মিলিয়ে দেখতে হয় কি কি বই হারালো বা কি কি বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই জন কর্মচারীর দ্বারা এই কাজ সম্ভব হয়। এক জন মঞ্চে রক্ষিত বইয়ের নাম ডাকতে থাকে আর এক জন মঞ্চতালিকার কার্ডগুলি নামের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে থাকে। মঞ্চে বইগুলি ঠিক যে হিসাবে সাজানো আছে, মঞ্চ-তালিকার কার্ডগুলিও ঠিক সেই হিসাবে সাজানো থাকে, সেইজন্যে মেলাবার কোন অসুবিধা হয় না। যে বইখানির নাম ডাকা হল অথচ মঞ্চে পাওয়া গেল না সেই বইয়ের কার্ডখানির উপর একটি ✓ দাগ দিলেই হল। মঞ্চের বই মেলানোর পর, পুস্তক নির্গমনের তালিকা ও বই-বাঁধাইয়ের তালিকার সঙ্গে শেল্ফ-তালিকা মেলানো হল। পরে যে কার্ডগুলোর উপর ✓ চিহ্ন রইলো, সেইগুলির একটি তালিকা করে ফেললেই পুস্তক-সম্ভারের হিসাব সম্পূর্ণ হলো।

তারিখ	০০০ প্রা	০০০ শি	১০০ প্রা	১০০ শি	২০০ প্রা	২০০ শি	৩০০ প্রা	৩০০ শি	৪০০ প্রা	৪০০ শি	৫০০ প্রা	৫০০ শি	৬০০ প্রা	৬০০ শি
১	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
২	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
৩	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৪	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৫	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৬	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৮	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৯	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
১০	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
১১	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
১২	...													...
১৩	...													...
১৪	...													...
১৫	...													...
১৬	...													...
১৭	...													...
১৮	...													...
১৯	...													...

৭০০ প্রা	৭০০ শি	৮০০ প্রা	৮০০ শি	৯০০ ৯০৯ প্রা	৯০০ ৯০৯ শি	৯৩০ ৯৯৯ প্রা	৯৩০ ৯৯৯ শি	৯১০ ৯১৯ প্রা	৯১০ ৯১৯ শি	৯২০ প্রা	৯২০ শি
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	..	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	..							
...	...	...	...	...							
...	...	...	...	...							
...	...	...	...	...							
...	...	...	...	...							
...	...	...	...	...							

পত্রিকা প্রা	পত্রিকা শি	উপন্যাস প্রা	উপন্যাস শি	বিশেষ সংকলন প্রা	বিশেষ সংকলন শি	মোট প্রা	মোট শি
...	...	.	...	...	...	...	...
...		...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

পুস্তক নির্গমনের মাসিক হিসাবের খাতা

পুস্তক নির্গমনের দৈনিক হিসাব

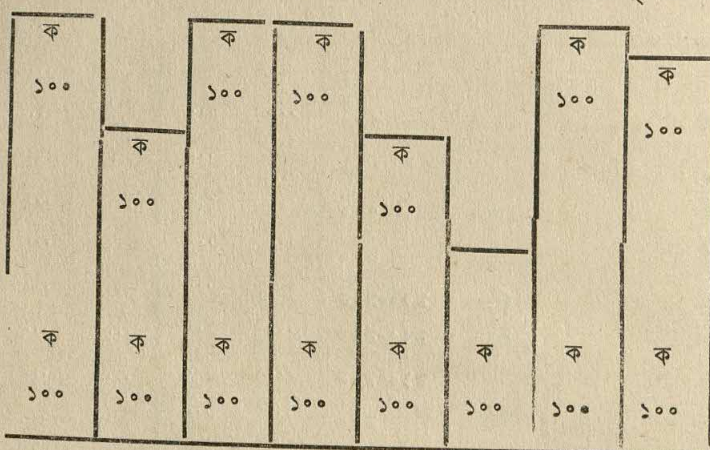
তারিখ

বিষয়		প্রাপ্ত বয়স্ক		শিশু	
সাধারণ	০০০	...	...	...	...
দর্শন	১০০	...	...	...	...
ধর্ম	২০০	...	...	...	...
সমাজতত্ত্ব	৩০০	...	...	...	...
ভাষা	৪০০	...	...	...	...
বিজ্ঞান	৫০০	...	...	...	...
„ ব্যবহারিক	৬০০	...	...	...	...
কলা	৭০০	...	...	...	...
সাহিত্য	৮০০	...	...	...	...
ইতিহাস {	৯০০-৯০৯	...	...	...	...
	৯৩০-৯৯৯	...	...	...	...
ভ্রমণ	৯১০-৯১৯	...	...	...	...
জীবনী	৯২০	...	...	...	...
পত্রিকা		...	...	...	...
মোট (উপন্যাস বাদে)		...	...	...	...
উপন্যাস		...	...	...	...
বিশেষ সংকলন		...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...
... ...	...	...	...	...	...
মোট :—		...	...	...	...

স্বাক্ষর.......................................

পুস্তক প্রস্তুতি

বইয়ের শিরদাঁড়ায় ডাক নং লেখা ঃ ডাক নং লেখা দুভাবে হয়ে থাকে। সোজাসুজি বইয়ের আবরণের উপর কালি দিয়ে লেখা হয়, না হয় আলাদা চৌকা বা গোল না হয় অন্য কোন আকারের কাগজের উপর ডাক নং লিখে বইয়ের শির-দাঁড়ার উপর আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। কিন্তু কাগজের ফলক শীঘ্র ময়লা হয়ে যায় এবং অনেক সময় পালিশ করা চামড়ার উপর বা কাগজের উপর মারা মুশকিল হয়,



$\frac{\text{ক}}{\text{১০০}}$ নং বইয়ের উপর দিকে লিখলে ও নিচের দিকে লিখলে মঞ্চে সাজানো বইগুলিকে কিরূপ দেখতে হয়।

ঠিক আটকে থাকে না। সেই জন্যে যে স্থানে ফলকটি মারা হবে সে স্থানটিকে বেশ করে ভিজিয়ে নিতে হবে, না হয় সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে নিয়ে পালিশ তুলে ফেলতে হবে, তার পর ভালো করে আঠা লাগিয়ে ফলক মারতে হবে। ফলকের সংখ্যাগুলি একরকমের হলে, এবং বইয়ের তলার দিক থেকে একই দূরত্বে থাকলে শেল্‌ফ-এর সৌন্দর্য বাড়ে। নিচের দিক থেকে ১" হতে ৩" দূরে ফলকগুলি মারা হয়। মোটা বইয়ের পিছনে অর্থাৎ শিরদাঁড়ায় ফলক আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু চটি বইয়ের পিছন দিকে উপরের দক্ষিণ কোণে ফলক মারতে হয়। তার কারণ, কত নম্বরের বই তা দেখবার জন্যে বইখানি একটু টেনে বার করলেই নম্বর চোখে পড়বে।

বই বাঁধতে দেবার সময় স্বর্ণাক্ষরে বইয়ের ডাক-নম্বর ছাপিয়ে নেওয়া ভালো। কম খরচায় বইয়ের ডাক-নম্বর লিখিয়ে নেবার উপায় হচ্ছে "Stylolectric" কলম ব্যবহার করা। ঠিক গায়ের চামড়ায় উল্কি পরানর মত এই কলমের দ্বারা কাজ হয়। সাত রকম রঙে ছাপা ½" কাগজের গোটা পাওয়া যায়। এক একটি গোটায় ১২০০টি ডাক-নম্বর লেখা হয়। এক একটি ডাক-নম্বর লিখতে খরচ পড়ে নামমাত্র।

প্রবেশ সংখ্যা ঃ পুস্তক প্রবেশের খাতায় বইখানি লেখা হলে পুস্তক প্রবেশের সংখ্যা বইয়ের কোন স্থানে লিখে রাখা দরকার। এই সংখ্যা সাধারণতঃ পুস্তকের নাম পত্রের পিছন দিকে লিখে রাখা হয়। পুস্তকের সংখ্যার হরফগুলি পুস্তকের আকার অনুযায়ী ছোট-বড় হওয়া দরকার।

বই খোলা ঃ বইয়ের যত্ন প্রসঙ্গে কেমন করে নতুন বই খুলতে হয় তা বলা হয়েছে সুতরাং নতুন করে তা আর এখানে বলা প্রয়োজন নেই।

পাতা কাটা ঃ পাতা কাটা পুস্তক প্রস্তুতির একটা কাজ। নতুন বইয়ের পাতা কিভাবে কাটতে হয় তা পুস্তকের যত্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

তারিখ পত্র ঃ তারিখ পত্র হবে ৬" × ৪" মাপের। তারিখ পত্র থাকবে বইয়ের প্রচ্ছদপটের ভিতর দিকে কিংবা বইয়ের পিছনের মলাটের ভিতর দিকে যদি পুস্তকের পরিচয় পত্র থাকে তা হলে ঠিক তার বাম দিকের পাতায় তারিখ পত্র থাকবে। বই কবে ফেরত দিতে হবে তা তারিখ পত্রে লেখা থাকবে।

তারিখ পত্র

পনের-দিনের মধ্যে বই ফেরত দিতে হবে

বুকপ্লেট ঃ বুকপ্লেট সাধারণতঃ সম্মুখের প্রচ্ছদপটের ভিতর দিকে থাকে। বুকপ্লেটে গ্রন্থাগারের কয়েকটি আইন লেখা থাকে। বুকপ্লেট সাধারণতঃ পুস্তকের মালিকত্ব প্রমাণ করে।

ডাক-সংখ্যা ঃ পুস্তকের ডাক-সংখ্যা লেখা হবে বইয়ের নাম পত্রের পিছন দিকে।

গ্রন্থাগারের নাম

ডাক সংখ্যা.........

খোলার সময়............................

....

সভ্য হবার নিয়ম........................

....

বই রাখিবার সময়........................

....

নতুন করে বই-নেওয়া....................

....

বইয়ের যত্ন............................

....

৩১/২" × ১৩/৪"

বইয়ের পুটে ডাক-সংখ্যা ঃ সাধারণতঃ নিচের দিক থেকে দুই ইঞ্চি ছেড়ে ডাক-সংখ্যা লিখতে হয়। ডাক-সংখ্যা লেখবার জন্য নানাপ্রকারের ও নানা-আকারের কাগজের বা কাপড়ের লেবেল পাওয়া যায়। প্রথমে লেবেলগুলি বইয়ের পুটে ভালো আঠার দ্বারা এঁটে নিতে হয়। পরে আঠা শুকিয়ে গেলে বইখানিকে মাঝামাঝি খুলে টেবিলের উপর উপুড় করে ফেলে লেবেলের উপর ডাক-সংখ্যা লিখতে হয়। পাতলা বইয়ের পিছন দিকের মলাটে উপর দিকে, পুটের কাছে কোণে ডাক-সংখ্যার লেবেল মারতে হয়।

বইয়ে গ্রন্থাগারের ছাপ দেওয়া ঃ ছাপ বেশি বড় না হওয়া ভালো। নামের পাতার পিছন দিকে ও বইয়ের ভিতরে কোন একটি নির্দিষ্ট পাতার নিচে

ছাপ দিতে হয়। নামের পাতার উপরে ছাপ দেওয়া খুব খারাপ নিয়ম কারণ চাপের ফলে ছাপ সম্মুখ চিত্রের উপর উঠতে পারে, ফলে সম্মুখ চিত্র নোংরা হয়ে যেতে পারে।

পুস্তক পরিচয় পত্রের পকেট ঃ পুস্তক পরিচয় পত্রের পকেট বইয়ের পিছনের মলাটের ভিতর দিকে থাকবে। মলাটের ধারের দিকে কোন এক কোণে পকেট না রাখলে বই বন্ধ করা মুশকিল হবে।

পুস্তকের জাতি-বিচার

পুস্তকের জাতি-বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে :—

১। কোন একখানি বই প্রয়োজন হলে যাতে বইখানি পুস্তক সংকলনের মধ্য থেকে খুঁজে বার করা যায়।

২। কোন বিষয়ের বইয়ের সংকলনের শক্তি কিরূপ, যাতে তা গ্রন্থাগারিক সহজে বুঝতে পারে।

৩। এবং একটি বিষয়ের সহিত আর একটি বিষয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা, যাতে পাঠককে একটি বিষয় থেকে ক্রমশঃ আর একটি বিষয়ে পরিচালিত করা যায়।

গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা কমই হক আর বেশিই হক কোন একটি নিয়মানুসারে তা সাজিয়ে রাখতে হবে এবং সে নিয়ম এমন হওয়া দরকার যাতে তা সহজে বোঝা যায় এবং তার মধ্যে কোন জটিলতা না থাকে এবং প্রয়োজন হলে নিয়ম ভঙ্গ না করে যে কোন নতুন বইকে বিষয়ানুযায়ী যথাস্থানে স্থান দেওয়া যায়। গ্রন্থাগারের পুস্তক মঞ্চে বইকে নানা উপায়ে সাজান যেতে পারে কিন্তু বই যেভাবেই সাজান হক একই বিষয়ের বই একস্থানে ও একই লেখকের কোন একটি বিষয়ের উপর লেখা সকল বই একস্থানে থাকা চাই। ফলে বইগুলিকে বিষয়ানুযায়ী সাজানই যুক্তিযুক্ত এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিভিন্ন লেখকের লেখা বইকে লেখকের নাম অনুযায়ী সাজালে পুস্তকের জাতি-বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়। কলেজে এবং স্কুলের গ্রন্থাগারে খেয়াল-খুশী অনুয়ায়ী বই না সাজিয়ে এমন একটি জাতি-বিচারের ছক ব্যবহার করা দরকার যার কার্যকারিতা যথেষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং যা সারা বিশ্বে প্রচলিত। ডিউই'র দশমিক বিভাগ এ ধরনের একটি ছক।

কোন গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলনের জাতি-বিচার করতে গেলে প্রথমে মোটামুটিভাবে এক এক বিষয়ের বইগুলিকে আলাদা করে নিতে হয় এবং পরে প্রত্যেক বইখানির বিষয়ানুযায়ী সূক্ষ্মভাবে জাতি-বিচার করতে হবে।

পুস্তকের জাতি-বিচারের কয়েকটি সমস্যা ওঠে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে গল্প ও উপন্যাসের বইকে জাতি-বিচারের ক্রম অনুযায়ী সাজান হবে কিনা ও অতিকায় ও ক্ষুদ্রকায় বইকে কিভাবে জাতি-বিচারের ক্রম অনুযায়ী মঞ্চে স্থান দেওয়া হবে।

যে সব কলেজের ও স্কুলের গ্রন্থাগারের পুস্তক-মঞ্চ পাঠকদের কাছে খোলা থাকে অর্থাৎ যে সব মঞ্চের ভিতর পাঠকদের যাবার এবং বই বার করে নেবার অধিকার

থাকে সে সব মঞ্চে গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রটিকে সারা মঞ্চে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভালো হয় কারণ মঞ্চের ভিতর গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ভিড় হবে বেশি এবং গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্র সারা মঞ্চে বিস্তারিত করতে পারলে মঞ্চের ভিতর একস্থানে ভিড় হবে কম। এভাবে একটি বিষয়কে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় Ribbon arrangement-এর দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যেক শেলফের একই থাকে সারা মঞ্চে গল্পের বই ও উপন্যাস ছড়িয়ে রাখতে হয়। মনে হয় যেন একটি ফিতা সমুদয় পুস্তক মঞ্চকে একই স্থানের উপর দিয়ে জড়িয়ে রয়েছে।

বড় বা ছোট বইগুলিকে সাজাবার নিয়ম হচ্ছে বইগুলি যে বিষয়ের বই এবং সেই বিষয়ের বইগুলি যে মঞ্চে রাখা হয়েছে, সেই মঞ্চেরই নিচের তাকে বইগুলিকে রাখতে হয়। এই কারণে প্রতি মঞ্চের নিচের তাকগুলি উঁচুদিকে অন্য তাক অপেক্ষা বড় থাকে। এ ভাবে বই সাজানকে বলে সমান্তরাল জাতি-বিচার বা parallel classification.

যে বইখানির জাতি-বিচার করতে হবে সেই বইখানি কি বিষয়ের উপর লেখা তা প্রথম ঠিক করে নিতে হবে। বইখানি কে খোঁজ করতে পারে এবং কোন্ বিষয়ে তা খোঁজ পড়বে তা বিচার করে দেখা দরকার। অনেক সময় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এবং স্কুল ও কলেজের চরিত্রের উপর পুস্তকের জাতি-বিচার নির্ভর করবে। পুস্তকের জাতি-বিচারের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব থাকা বিপজ্জনক কারণ মনে রাখতে হবে যাদের জন্যে বই তাদের সুবিধা করবার জন্যে বইয়ের জাতি-বিচার করা হচ্ছে।

জাতি-বিচারের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম :—

১। বইখানি যে স্থানে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে সেইখানে রাখতে হবে।

২। প্রথম জাতি-বিচার করুন বিষয় অনুযায়ী পরে যে রূপে বিষয়টি বিচার করা হয়েছে সেই রূপে যেমন :—বিজ্ঞানের অভিধান : বিষয়=বিজ্ঞান=৫০০, রূপ =অভিধান=৩ :: ৫০৩।

৩। পুস্তকটি যে বিষয়ের উপর লেখা সেই বিষয়েই বইখানিকে জাতি-বিচার করুন। অর্থাৎ জ্যামিতির কোন বইকে অঙ্কের বইয়ের মধ্যে না রেখে জ্যামিতির মধ্যে রাখুন।

৪। একখানি বই বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত হলে যে বিষয়টি প্রধান সেই বিষয়ে বইখানির জাতি-বিচার করুন। যদি কোন্ বিষয়টি প্রধান তা ঠিক করতে পারা না যায় তা হলে প্রথম বিষয়টিতে বইখানির জাতি-বিচার করুন।

৫। একখানি বইয়ে কোন একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিকের কথা বলা হলে বইখানিকে সাধারণ ক্ষেত্রে ফেলুন।

৬। আজকাল জ্ঞানের বহু নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে। ছকের মধ্যে নতুন বিষয়টিকে, যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বেশি সেই বিষয়ের কাছাকাছি ফেলবার চেষ্টা করুন।

৭। বইখানিকে এমন কোন স্থানে ফেলবেন না, যেখানে ফেললে কথা উঠতে পারে।

প্রথম নিয়মটি ঠিকমত কাজে লাগাতে গেলে, জাতি-বিচারকের পাঠকদের সম্বন্ধে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। এই নিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে বইখানিকে প্রয়োজনীয় করে তোলা। স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক একাধারে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে, তার পক্ষে এ আইনটি ঠিক মত কাজে লাগাতে কোন অসুবিধা হবে না।

অনেক সময় মনে হয় একবার বইখানিকে খুললেই বইখানির বিষয় এবং তা কিরূপে বলা হয়েছে তা নির্ণয় করতে পারা যাবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বইখানির বিষয় নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে বইখানির জাতি-বিচার সঙ্গে সঙ্গে না করে দু একদিন ফেলে রাখা ভালো। এরূপ ক্ষেত্রে বইয়ের বিষয় নিয়ে যত বেশি চিন্তা করা হয় তত বেশি বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে।

অনেকের মতে খুব ছোট গ্রন্থাগারে, যেখানে পুস্তকের সংখ্যা কম সেখানে অতি সূক্ষ্মভাবে পুস্তকের জাতি-বিচার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই যাবে ফলে গোড়াতেই সূক্ষ্মভাবে পুস্তকের জাতি বিচার না করলে, পরে জাতি-বিচারের উদ্দেশ্য সফল হবে না এবং প্রত্যেক বইখানিকে সূক্ষ্মভাবে জাতি-বিচার না করার ফলে নানা প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সূক্ষ্মভাবে জাতি-বিচার করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। উপরন্তু তৃতীয় আইনটিকে ঠিক মত কাজে না লাগালে প্রথম আইনটি ঠিকমত কাজে লাগান যাবে না।

সপ্তম আইনটিকে কাজে লাগাবার জন্যে নিজের মনকে খোলা রাখতে হবে। কোনরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে পুস্তকের জাতি-বিচার করলে চলবে না। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে এক্ষেত্রে কাজে লাগান বিপজ্জনক। নানা বিষয়ের উপর

ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে কাজ করতে গেলে চলবে না। এক্ষেত্রে সব সময় প্রথম নিয়মটির কথা মনে রেখে, পাঠকদের উপর লক্ষ্য রেখে জাতি-বিচার করতে হবে।

জাতি-বিচার করবার শুরুতেই একটা কথা মনে রাখতে হবে জাতি-বিচারের ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে তা কয়েক বছরের মধ্যেই ভেঙে পড়বে এবং পরে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারকে নতুন করে জাতি-বিচার করতে গেলে খরচ ও সময়ের অন্ত থাকবে না।

ডিউই'র দশমিক বিভাগ

আধুনিক যুগের পুস্তকের জাতি-বিভাগের জন্যে যে-সকল ছক তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে জন মেলভিল্ ডিউই'র দশমিক জাতি-বিভাগই হল সর্বপ্রধান এবং এই ছকটিই আজ সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হয়তো এই বিভাগের অবিমিশ্র চিহ্ন এবং এর সম্প্রসারণশীলতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, ডিউই'র এই বিভাগ তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। এ-বিভাগের জন্য তিনি হ্যারিসের কাছে কতকটা ঋণী এবং হ্যারিস আবার বেকনের কাছে ঋণী। ডিউই'র বিভাগের দোষ অনেক আছে। এই বিভাগের এমন অনেক দোষ দেখানো যায়, যার যুক্তিযুক্ত উত্তর কিছু দেওয়া যায় না। তবু এ-কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ডিউই'র ছক পুস্তক-বিভাগের কাজে লাগছে এবং সেই কারণেই এ-বিভাগের এত বেশি প্রচার।

জন মেলভিল্ ডিউই'র জন্ম হয় নিউইয়র্কের অ্যাডাম্স্ সেণ্টারে (Adam's Centre, NY.) ১৮৫১ সালে। তিনি আমহার্স্ট কলেজে লেখাপড়া শেষ করেন ১৮৭৪ সালে এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি অ্যামেরিকান লাইব্রেরি এসোসিয়েশন-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে তিনি নিউইয়র্ক স্টেট লাইব্রেরি'র গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই তিনি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের স্কুল খোলেন। ডিউই'র নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর দশমিক বিভাগের প্রচার হবার পর।

ডিউই হ্যারিসের বিভাগ গ্রহণ করেন এবং সেগুলির ০—৯ পর্যন্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন :

০ সাধারণ জ্ঞান	৫ বিজ্ঞান
১ দর্শন	৬ ব্যবহারিক বিজ্ঞান
২ ধর্ম	৭ ললিতকলা
৩ সমাজতত্ত্ব	৮ সাহিত্য
৪ ভাষাবিজ্ঞান	৯ ইতিহাস

ডিউই'র সাঙ্কেতিক চিহ্নের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি। সেই কারণে আমরা বলতে পারি ঃ

০০০	সাধারণ জ্ঞান	৫০০	বিজ্ঞান
১০০	দর্শন	৬০০	ব্যবহারিক বিজ্ঞান
২০০	ধর্ম	৭০০	ললিতকলা
৩০০	সমাজতত্ত্ব	৮০০	সাহিত্য
৪০০	ভাষাবিজ্ঞান	৯০০	ইতিহাস

অবশ্য দর্শন বলতে আপনি ১ই বলুন, আর ১০০ই (এক শূন্য শূন্যই) বলুন, তাতে কিছু এসে যায় না। তার কারণ, দশমিক সংখ্যায় ডান দিকের শূন্যের কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ-কথাও ভুললে চলবে না যে, ডিউই'র সংখ্যা ঠিক গণিতের দশমিক সংখ্যা নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রকে ১০টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে বলে এই বিভাগের নাম দশমিক বিভাগ। কোন সংখ্যার গোড়ায় এক থাকলে বুঝতে হবে সংখ্যাটির মূলক্ষেত্র দর্শন। যেমন ধরুন ১৫০। একশত পঞ্চাশ বলতে বুঝতে হবে :

১০০ দর্শন
৫০ মনোবিজ্ঞান

অর্থাৎ দর্শনের সঙ্গে তার বিশেষ চরিত্র মনোবিজ্ঞান জুড়ে দেওয়ায় দর্শনের একটি নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হল এবং সেই ক্ষেত্রটি হল দর্শনের পঞ্চম ভাগ। দর্শনের অন্যান্য ভাগ হল ঃ

০০০	দর্শন	১৫০	মন
১১০	অধ্যাত্মবিদ্যা	১৬০	তর্কশাস্ত্র
১২০	„ (বিশেষ ক্ষেত্র)	১৭০	নীতিশাস্ত্র
১৩০	মন ও শরীর (মনস্তত্ত্ব)	১৮০	পুরাকালের দার্শনিকগণ
১৪০	দর্শনের বিভিন্ন প্রণালী	১৯০	আধুনিক কালের দার্শনিকগণ

এই হল দর্শনের নয়টি ভাগ। মূলক্ষেত্র দর্শনকে ধরলে হয় দশটি ক্ষেত্র। এই দশটি ক্ষেত্রের মধ্যে যে-কোন একটি ক্ষেত্রকে আবার দশটি ভাগে ভেঙে ফেলা যায়। তার ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে যত সূক্ষ্মভাবে সম্ভব, ভাগ করার সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ আর একটি বিভাগের কথা ধরুন :

৪০০	ভাষাবিজ্ঞান	৪৫০	ইতালীয় ভাষা
৪১০	তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৪৬০	স্পেনীয় "
৪২০	ইংরেজী ভাষা	৪৭০	ল্যাটিন "
৪৩০	জার্মান "	৪৮০	গ্রীক "
৪৪০	ফরাসী "	৪৯০	অন্যান্য "

ভাষাবিজ্ঞানের এই হল দশটি ভাগ। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, এই বিভাগের মধ্যে কেবল পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলিকে অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে এমন একটি ক্ষেত্র (৪৯০ অন্যান্য) বাকী আছে, যাকে বিভাগ করে পৃথিবীর আর সকল ভাষাকেই তার মধ্যে ফেলা যায়। এ-বিভাগের মধ্যেও একটা নিয়ম মেনে চলা হয়। তার কারণ, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলির সব ক'টিরই ল্যাটিন ভাষা থেকে উৎপত্তি, কেবল স্লাভিক (Slavic) জাতীয় ভাষা বাদে। এখন ৪৯০কে ভাগ করে ৪৯১ দিয়ে আমরা ল্যাটিন ভাষার নিকট-আত্মীয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রটিকে প্রকাশ করতে পারি। বাংলা ভাষা ঐ ক্ষেত্রেরই একটি অংশ। সুতরাং বাংলা ভাষায় আসতে হলে আমাদের বিভাগ হবে :

৪০০	ভাষাবিজ্ঞান
৪৯০	(৯ম ভাগ) অন্যান্য
৪৯১	(১ম ভাগ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা
৪৯১·৪	ভারতীয় ভাষা
৪৯১·৪৩	হিন্দী "
৪৯১·৪৪	বাংলা "

সম্পূর্ণ বিভাগটি আমরা দিলাম না। ৪৯০-এর প্রথম ভাগের চতুর্থ ভাগ হল ভারতীয় ভাষা, চতুর্থ ভাগের তৃতীয় ভাগ হল হিন্দী, এবং চতুর্থ ভাগ হল বাংলা।

৪৯১-এর পর একটি বিন্দু দিয়ে তবে পুনরায় বিভাগ করা হয়েছে। যখনই জ্ঞানের ক্ষেত্রের তৃতীয় ভাগের আরো বিভাগ করা হয়, তখনই একটি বিন্দু ব্যবহার করে তবে বিভাগ করতে হয়।

ডিউই'র এই ভাষা-বিভাগটি অতি প্রয়োজনীয়। কেন প্রয়োজনীয়, তা আমরা বলছি। ভাষা-বিজ্ঞানের সংখ্যার প্রথম সংখ্যা ৪ নির্দেশ করছে ভাষা।

৪-এর স্থানে যদি ৮ ব্যবহার করেন, তা হলেই আপনি সাহিত্যের ক্ষেত্রটি পেয়ে যাবেন। ডিউই'র ১৪শ সংস্করণের ৮০০-এর প্রথম বিভাগ হচ্ছে আমেরিকার সাহিত্য। কিন্তু আমেরিকার ভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় কোন প্রভেদ নাই বলে ১৬শ সংস্করণে তার পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা ১৪শ সংস্করণের ভাগ এখানে দিলাম:

সাহিত্য

৮০০	সাহিত্য	৮৫০	ইতালীয় সাহিত্য
৮১০	আমেরিকার সাহিত্য	৮৬০	স্পেনীয় "
৮২০	ইংরেজী "	৮৭০	ল্যাটিন "
৮৩০	জার্মান "	৮৮০	গ্রীক "
৮৪০	ফরাসী "	৮৯০	অন্যান্য "

এখানে দেখুন, ভাষার দশটি বিভাগের কেবল সাহিত্যের সংখ্যাটি (৮) ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে আমরা ভাষা-অনুযায়ী সাহিত্য পেয়ে গেলাম।

এখন যদি এই সাহিত্যের নবম ক্ষেত্রকে পুনরায় বিভাগ করেন, তা হলে আপনি অন্যান্য ভাষার সাহিত্য পেয়ে যাবেন। সুতরাং ডিউই'র ১৪শ সংস্করণে সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিভাগ যদিও দেওয়া নেই, তা হলেও সাহিত্যের কোন একটি ক্ষেত্রের বিভাগ পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। যেমন ধরুন, যদি আমাদের বাংলা সাহিত্যের জন্য সংখ্যার প্রয়োজন হয়, তা হলে আমাদের ভাষার বিভাগ থেকেই সে-সংখ্যা বার করতে হবে। বাংলা ভাষা হল ৪৯১'৪৪। এখন প্রথম সংখ্যা ৪ (ভাষা)-এর স্থলে ৮ (সাহিত্য) বসিয়ে দিলে হয় ৮৯১'৪৪। এই সংখ্যাটি বোঝাবে বাংলা সাহিত্য।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, বিষয়ের বিশেষ চরিত্র আছে। সেই রকম সাহিত্যেরও বিশেষ রূপ আছে, যেমন—কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, পত্র, কৌতুক। এই রূপগুলির দ্বারা ভাষাকে প্রথমে বিভক্ত করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের রূপ-অনুযায়ী ভাগ করলে দাঁড়ায় এই:

৮৯১'৪৪	বাংলা সাহিত্য	
৮৯১'৪৪১	+	কবিতা
৮৯১'৪৪২	+	নাটক

৮৯১·৪৪৩ বাংলা সাহিত্য + গল্প ও উপন্যাস
৮৯১·৪৪৪ + প্রবন্ধ
৮৯১·৪৪৫ + বক্তৃতা
৮৯১·৪৪৬ + পত্র
৮৯১·৪৪৭ + কৌতুক
৮৯১·৪৪৮ + প্রবাদ, ছড়া, উদ্ধৃতি
৮৯১·৪৪৯ + অন্যান্য

এই ক্ষেত্রগুলির যে-কোন একটিকে বিভাগ করা চলে—প্রথমে সাহিত্যের যুগ অনুসারে, তার পর লেখক অনুসারে। বাংলা কবিতার বিভাগ কিরূপে করা যেতে পারে, দেখুন :

৮৯১·৪৪১ বাংলা কবিতা
৮৯১·৪৪১১ আদিযুগ
২ মধ্যযুগ
৩ আধুনিক-পূর্ব যুগ
৪ আধুনিক (প্রথম যুগ)
৫ „ (দ্বিতীয় যুগ)
৬ „ (তৃতীয় যুগ)
৭ }
৮ } ভবিষ্যৎ যুগের স্থান
৯ }

এখন যদি আদিযুগকে বিভাগ করেন, তা হলে দাঁড়ায় :

৮৯১·৪৪১১১
২
৩
৪
৫ রামায়ণ
৬ মহাভারত
৭ ভাগবত
৮
৯ অন্যান্য

মধ্যযুগকে বিভাগ করলে দাঁড়ায়ঃ

৮৯১'৪৪১২১ শিবমঙ্গল
২ মনসামঙ্গল
৩ চণ্ডীমঙ্গল
৪ অন্নদামঙ্গল
৫ ধর্মমঙ্গল
৬ কালিকামঙ্গল
৭ বৈষ্ণব পদাবলী
৮
৯ অন্যান্য

আধুনিক প্রথম যুগকে ভাগ করলে দাঁড়ায়ঃ

৮৯১'৪৪৪ আধুনিক (প্রথম যুগ)
১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ মাইকেল
৪ হেমচন্দ্র
৫ নবীনচন্দ্র সেন
৬ অক্ষয়চন্দ্র
৭ ঈশানচন্দ্র
৮ রাজকৃষ্ণ রায়
৯ অন্যান্য

এমনিভাবে আমরা বাংলা সাহিত্যকে ভাগ করে যেতে পারি। যে-কেউ বাংলা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস-পুস্তকের সাহায্যে এরূপ বিভাগ করে নিতে পারেন। তবে এমন একটি বিভাগ হওয়া চাই, যা সকলে মেনে নিতে পারে।

সাহিত্যের সাধারণ ক্ষেত্রকে আবার দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিভাগ করা চলে এবং তার প্রয়োজনও আছে। কেবল সাহিত্যের সাধারণ ক্ষেত্রেরই যে এরূপ বিভাগ করা প্রয়োজন তা নয়, যে-কোন সাহিত্যকে এরূপে ভাগ করা চলে। কেন না, সাহিত্যের ইতিহাস যেমন থাকতে পারে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও থাকতে পারে।

দৃষ্টিকোণ

১ দর্শন
২ সংক্ষিপ্তসার
৩ অভিধান
৪ প্রবন্ধ
৫ পত্রিকা
৬ সাহিত্য-সঙ্ঘ
৭ শিক্ষা, গবেষণা
৮ সংগ্রহ
৯ ইতিহাস

ব্যবহারের নিয়ম

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, দৃষ্টিকোণগুলি কোন বিষয়ের বিশেষ চরিত্র, অর্থাৎ অন্তর্নিহিত চরিত্র নয়। আমরা যদি বলি বাংলা কবিতার ইতিহাস, তা হলে বোঝায় এই :

সাহিত্য + বাংলা (ভাষা) + কবিতা (রূপ) + ইতিহাস (দৃষ্টিকোণ)

এক্ষেত্রে দেখুন, আমাদের বিভাগের নিয়ম বার বার ভঙ্গ করতে হয়েছে। চরিত্র এখানে তিনটি : ভাষা + কবিতা + ইতিহাস।

মূল চরিত্র হচ্ছে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান :

০ জ্ঞানের সাধারণ ক্ষেত্র
৮ (অষ্টম বিভাগ) সাহিত্য
৯ অন্যান্য সাহিত্য
১৪৪ বাংলা সাহিত্য
১৪৪১ কবিতা-রূপ বাংলা সাহিত্য
·০৯ বাংলা কবিতার ইতিহাস

দেখুন, দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করবার সময় শূন্য ব্যবহার করে তবে দৃষ্টিকোণের সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। এই শূন্যের (০) একটি বিশেষ ব্যবহারিক মূল্য আছে। যখনই কোন একটি সংখ্যার ভিতরে এরূপ শূন্য থাকবে, তখনই বুঝতে হবে বিভাগের চরিত্র পরিবর্তন করা হয়েছে। আর একটি উদাহরণ :

৫০০ বিজ্ঞান
৫০১ বিজ্ঞান + দর্শন
৫১০ অঙ্ক
৫১০·১ অঙ্কের দর্শন
৫১২ বীজগণিত
৫১২·০৯ বীজগণিতের ইতিহাস

এই বিভাগের মধ্যে দেখুন মূল চরিত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। চরিত্রের পরিবর্তন যে করা হচ্ছে, তা শূন্যের (০) দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে। ৫০১ বলতে বিজ্ঞানের দর্শন। ৫১২ = বিজ্ঞান + গণিত + বীজগণিত। এখানে বিজ্ঞানের চরিত্র তিনটি বিভাগেই রয়েছে এবং সেই চরিত্রের উপর ভিত্তি করেই বিভাগ হচ্ছে। ৫১২-এর পর একটি শূন্য দিয়ে ৯ ব্যবহার করা হল। এখানে শূন্য (০) দেওয়ার ফলে মূল চরিত্র-অনুযায়ী বিভাগ বন্ধ করে অন্য চরিত্রের উপর নির্ভর করে যে বিভাগ হচ্ছে, তা বুঝতে পারা গেল এবং শূন্যের পর যেই ৯ দেওয়া হল, তখনই বোঝা গেল ৫১২-এর ইতিহাস অর্থাৎ বীজগণিতের ইতিহাস।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যেখানে এইরূপ দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিভাগ না করলে নয়, কেবল সেই ক্ষেত্রেই ডিউই এইরূপ বিভাগ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং চোখ বুজে এরূপ দৃষ্টিকোণ-সূচক সংখ্যার ব্যবহার করলে ভুল হবে। যে-সব ক্ষেত্রে এরূপ বিভাগ নির্দেশ করা আছে, কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই এইরূপ বিভাগ করতে হবে। অন্য কোন ক্ষেত্রে এরূপ বিভাগের প্রয়োজন হলে, তা ব্যবহার করতে হবে ডিউই'র বইয়ের শেষের দিকে যে ছক দেওয়া আছে, সেই ছক অনুসারে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এইরূপ বিভাগ আছে। সে-ক্ষেত্রে এইরূপ বিভাগ যুগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়ঃ

ইতিহাসের বিভাগ

৯০০	ইতিহাস	৯৫০	এশিয়ার ইতিহাস
৯১০	ভূগোল, ভ্রমণ, বর্ণনা	৯৬০	আফ্রিকার ,,
৯২০	ব্যক্তির ইতিহাস (জীবনী)	৯৭০	উত্তর আমেরিকার ইতিহাস
৯৩০	প্রাচীন ইতিহাস	৯৮০	দক্ষিণ আমেরিকার ,,
৯৪০	ইউরোপের ইতিহাস	৯৯০	মেরু-প্রদেশের ,,

এই বিভাগে লক্ষ্য করছেন, সারা পৃথিবীকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রকে পুনরায় ৯টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

৯০০ ইতিহাস
৯৫০ এশিয়ার ইতিহাস
৯৫১ চীনের ইতিহাস
৯৫২ জাপানের ইতিহাস

৯৫৩ আরবের ইতিহাস

৯৫৪ ভারতের ইতিহাস

এর পর আবার ভারতের প্রদেশ-অনুযায়ী বিভাগও করা যায় :

৯৫৪ ভারতের ইতিহাস

৯৫৪.১ বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহার

৯৫৪.২ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি

ডিউই'র ১৬শ সংস্করণে এ-বিভাগের পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে যে-বিভাগের কথা বলা হল তা ১৪শ সংস্করণের।

কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ-অনুযায়ী বিভাগ করার প্রয়োজনও আছে। কারণ, বিশেষ বিশেষ যুগ সম্বন্ধে লেখা বহু বই থাকতে পারে। দৃষ্টিকোণের সংখ্যাগুলিই যুগনির্ণয় করবার জন্য ব্যবহার করতে হয়। যেমন :

৯৫৪ ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস

.০১ মধ্যযুগ

.০২ মোগল-রাজত্বকাল

.০৩

.০৪

.০৫ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি

.০৬

.০৭

.০৮ বৃটিশ রাজত্বকাল

.০৯ স্বাধীন ভারত

প্রত্যেক বিভাগের আবার আরো সূক্ষ্মতর বিভাগ করা যেতে পারে।

ডিউই দেশবিদেশের ইতিহাসের সংখ্যা দিয়েছেন ৯৩০ থেকে ৯৯৯-এর মধ্যে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস হচ্ছে ৯৩৪। এই বিভাগেরও আরো বিভাগ করা চলে।

ইতিহাসের সংখ্যাগুলি অতি প্রয়োজনীয়। তার কারণ, যে-কোন বিষয়েই দেশ অনুসারে বই লেখা হতে পারে। সেই কারণে যে-কোন বিষয়কেই দেশানুযায়ী বিভাগ করবার প্রয়োজন হয়। যেমন ধরুন, ভারতের ভূবিজ্ঞান, ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা, ভারতীয় মজুর, ভারতীয় বেকার-সমস্যা ইত্যাদি। যে-সব ক্ষেত্রে এরূপ দেশানুযায়ী বিভাগের প্রয়োজন, ডিউই তাঁর ছকে লিখেছেন, সে-সব ক্ষেত্রে বিষয়

৯৩৩—৯৯৯ অনুসারে বিভাজ্য। কোন বিষয়ের দেশানুযায়ী বিভাগ করবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমতঃ বিষয়ের সংখ্যাটি বার করে, তাতে দেশের সংখ্যাটি জুড়ে দিতে হয়। ৯৫৪ সংখ্যাটি ভারতবর্ষের ইতিহাস, কিন্তু ভারতবর্ষের সংখ্যা হচ্ছে ৫৪। সুতরাং যখনই কোন দেশের সংখ্যা বার করতে হবে, তখনই ইতিহাসের সংখ্যা ৯ বাদ দিতে হবে।

৩৫৪ শাসন-পদ্ধতি হলে—
৩৫৪·৪২ ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি
৩৫৪·৪৩ জার্মানীর "

কিন্তু এরূপ বিভাগে বিপদ আছে। কারণ, এমনিভাবে যে-কোন বিষয়ের সংখ্যায় দেশের সংখ্যা ব্যবহার করলে, অন্য বিষয়ের সংখ্যার সঙ্গে গোল বাধতে পারে। সেইজন্যে যে-সব ক্ষেত্রে গোল বাধবার সম্ভাবনা আছে, সে-সব ক্ষেত্রে ডিউই'র ২নং ছক ব্যবহার করতে হয়।

ভূগোল

৯১০ হল ভূগোলের বিভাগ। এই বিভাগ যে কেবল ভূ-বর্ণনা বোঝায় তা নয়, দেশ-বিদেশের সামাজিক অবস্থাও বোঝায়। এই বিভাগকে ইতিহাসের বিভাগ অনুসারে ভাগ করা যায়। এই বিভাগকে সম্প্রসারণ করবার একটি সোজা উপায় হচ্ছে, প্রথমতঃ কোন দেশের ইতিহাসের সংখ্যা বার করে, সেই সংখ্যায় ইতিহাসের সংখ্যা ৯-এর পর একটি ১ বসিয়ে দিলেই কাজ মিটে যায়। যেমন ধরুন, বাংলার ইতিহাস হচ্ছে ৯৫৪·১। এখন বাংলার ভূগোল, বাংলার অবস্থা, বা বাংলায় ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয় বোঝাতে এই সংখ্যাটি ব্যবহার করতে হলে সংখ্যাটি হবে ৯১৫·৪১। অর্থাৎ—

৯ ইতিহাস
১ ভূগোল
৫ এশিয়া
৪ ভারতবর্ষ
১ বাংলাদেশ

ধরুন, আর একখানি বই, যেমন ভারতীয় অর্থনীতি। ভারতীয় অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়? অর্থনীতি একটি বিশেষ ধরনের জ্ঞান। এ জ্ঞান দেশ-দেশান্তর হিসাবে ভিন্ন হতে পারে না। কারণ, জ্ঞান সব সময়ে সত্য, অন্ততঃ সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়—যদিও তা যে সত্য নয়, সে-কথা আমরা বহুবার

বলেছি। যা সত্য, তা সকল দেশের পক্ষেই সত্য এবং তার প্রয়োগও সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে হবে। ভারতের অর্থনীতি বলতে সত্যিই অর্থনীতি বোঝায় না, ভারতের অর্থনীতি বলতে বোঝায় ভারতের আর্থিক অবস্থা। অবশ্য এ-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ এরূপ বইয়ের সংখ্যা তৈরী করেন ৩৩০.৯৫৪ দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংখ্যা ৯১৫.৪ হলেই ভালো হয়। ডিউই নিজে বহু ক্ষেত্রে এইরূপ সংখ্যাই ব্যবহার করছেন। কোন দেশের আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি দেশের বর্ণনার সংখ্যা ব্যবহার করতে বলেছেন।

জীবনী

জীবনী দুরকমের হতে পারে। প্রথম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনী। ব্যক্তিগত জীবনী বলতে ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাস বলতে এই ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসের সমষ্টিকে বোঝায়। ভারতের ইতিহাস বলতে কি সত্যিই আমরা ভারতের মানুষের ইতিহাস বুঝি? স্কুল-কলেজে আমরা এই কথাই শুনে আসছি বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এ-কথা কী সাংঘাতিক ভ্রমাত্মক! ইতিহাসের ভিতরে আমরা কি পাই? কতকগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের বিবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এরূপ ইতিহাসকে রাষ্ট্রিক ইতিহাস বলাই ভালো। তা বললে কিন্তু আর এক সমস্যা ওঠে। এরূপ ইতিহাসকে অর্থনৈতিক ইতিহাসও (Economic history) বলা যেতে পারে। এ-সব ক্ষেত্রে বিভাগের নিয়ম হচ্ছে, বইয়ে যে-বিষয়ের প্রাধান্য থাকে, তার উপর নির্ভর করে বিভাগ করা। ইতিহাস অপেক্ষা রাষ্ট্র যদি প্রধান হয়, তা হলে সেরূপ বইকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ভিতর দেশীয় বিভাগ দিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত।

এখন জীবনীর কথা ধরুন। প্রথম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনী, যেখানে ব্যক্তিই প্রধান। আবার ব্যক্তিগত জীবনী এমন হতে পারে, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তি যে-বিষয়ের লোক, সেই বিষয়ই প্রধান। সুতরাং জীবনীকে দুরকম ভাবে ভাগ করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনীতে যেখানে বিষয়ের প্রাধান্য থাকে, সেখানে সেই জীবনীর বই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিতর রাখতে হবে। নতুবা ব্যক্তিগত জীবনীকে বিষয়ের প্রাধান্য অনুসারে ভাগ করতে হবে, যেমন :

৯২০	জীবনী	
৯২১	„	(দর্শন)
৯২২	„	(ধর্ম)
৯২৩	„	(সমাজতত্ত্ব)

৯২৪ জীবনী (ভাষা)
৯২৫ „ (বিজ্ঞান)
৯২৬ „ (ব্যবহারিক বিজ্ঞান)
ইত্যাদি

এখন ধরুন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী। এরূপ একখানি বইয়ের সংখ্যা হবে:

৯২৫ বিজ্ঞানের লোক
৯২৫·৪ রসায়ন শাস্ত্রের লোক

কিন্তু এতেও সূক্ষ্ম বিভাগ হল না। কারণ, এই সংখ্যা বিদেশী কোন রাসায়নিকের জীবনীও বোঝাতে পারে। সুতরাং দেশানুযায়ী বিভাগ করতে হবে। তাহলে আমাদের সংখ্যাটি হবে ৯২৫·৪৫৪। কিন্তু এ-বিভাগেও ভারতীয় অন্য কোন রাসায়নিক পড়তে পারেন। এখন দেখতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রসায়নের কোন্ ক্ষেত্র সম্পর্কে কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে Iodides। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে তাঁকে প্রথমতঃ Iodide-এর ভিতর ফেলে, তবে দেশানুযায়ী বিভাগ করতে হয়।

জীবনীকে বিষয়ের ভিতরও ফেলা চলে। ডিউই'র বইয়ে তার ইঙ্গিত আছে।

এই হল সংক্ষেপে ডিউই'র বিভাগের বর্ণনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে ডিউই'র ১৪শ সংস্করণের উপর নির্ভর করে এ বর্ণনা দেওয়া হলেও ডিউই'র ১৬শ সংস্করণে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বিষয় অনুসারে জাতি বিচারের অসুবিধা

আমরা বার বার বলেছি, পাঠকের জন্যেই বই এবং পাঠকের জন্যেই গ্রন্থাগার। সুতরাং গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে গেলে, তা পাঠকের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। বইয়ের জাতিবিভাগ করতে গেলে, বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়টি নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিশীলতার উপর নির্ভর করে বিচার করলে চলবে না। বইখানিকে সব সময়ে বিচার করতে হবে পাঠকের দিক থেকে, পাঠকের মন দিয়ে, পাঠকের প্রয়োজনানুসারে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ব্যাপারটিকে যে সম্ভবপর বলে মনে হয় না, তা খুবই সত্যি। কিন্তু যাঁরা গ্রন্থাগারে কাজ করছেন, তাঁরা জানেন যে, এরূপভাবে বইয়ের জাতি-বিচার করা সম্ভবপর এবং সে-জ্ঞান পাঠকের সঙ্গে ও পাঠক-মনের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচিত হওয়ার ফলে অর্জন করা যায়।

লেখক কি বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা বোঝা যাবে বইয়ের কয়েকটি অংশ দেখে। প্রথমতঃ বইয়ের নাম। বইয়ের নাম দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বইয়ের বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের নাম থেকে বিষয় ধরে নিয়ে পুস্তকের জাতি-বিচার করলে তা খুবই ভুল হতে পারে। যেমন 'ব্ল্যাক ওপিয়াম', 'মার্স' ইত্যাদি বই। 'ব্ল্যাক ওপিয়াম' দেখলেই মনে হবে আফিং-সম্বন্ধীয় বই এবং 'মার্স' (Mars) দেখলেই বইখানি জ্যোতিষসংক্রান্ত ও গ্রহনক্ষত্র-বিজ্ঞান বিষয়ের মনে হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পুস্তকের সূচীপত্র দেখলে পুস্তকের বিষয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হবে।

এতেও যদি বইখানি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারা না যায়, তা হলে বইয়ের কিছু কিছু অংশ পড়ে দেখা প্রয়োজন।

আবার এমন অনেক বই আছে, যার বিষয় ঠিক করতে পারা গেলেও, স্থান-নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। যেমন ধরুন, মোহিতলালের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য'। এখানে যদি বইখানিকে প্রবন্ধের পর্যায়ে ফেলেন, তা হলে ভুল হবে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে যারা পড়বে, তারা খোঁজ করবে এই বইখানির। এরূপ ক্ষেত্রে বইখানিকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন।

আবার ধরুন, রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব। এরূপ বই বিহারীলালের বইয়ের সঙ্গে না রেখে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সঙ্গে রাখা প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে প্রভাবিত বিষয়টির মধ্যে বইখানিকে রাখা।

তার পর ধরুন, একখানি প্রবন্ধের বই, যাতে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ আছে। এরূপ বইকে প্রথম প্রবন্ধের বিষয়ে ফেলা দরকার। কিন্তু অন্য যে বিষয়গুলি বইখানির ভিতর আছে, তা-ও পাঠককে জানাতে হবে এবং তার একমাত্র উপায় হচ্ছে পুস্তকতালিকায় অবশিষ্ট বিষয়গুলির তালিকা করা।

এরূপ আরো বহু নিয়ম আছে। সে-সব নিয়মের বর্ণনা দেবার মত স্থান এখানে নেই। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হলে 'Classifier's Code' নামক বইখানি পড়া দরকার।

আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পুস্তকের জাতি-বিচার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সেই কারণে বহু ক্ষেত্রে দুজনের একই বইয়ের জাতি-বিচার ভিন্ন হয়ে যায়। সেই জন্যে যে-বইয়ের জাতি-বিচার করতে হবে, সেই বইখানি বা ঠিক সেই রকমের কোন বই গ্রন্থাগারে আছে কিনা, তা দেখে নেওয়া দরকার। যদি দেখা যায়, সেরূপ বই আছে, তা হলে যে সংখ্যা সেই বইয়ে দেওয়া

আছে, নতুন বইয়েও সেই সংখ্যা দেওয়া উচিত। পুরাতন সংখ্যা একেবারে ভুল না হলে, তার পরিবর্তন করা উচিত নয়। এরূপ সতর্কতার সঙ্গে বইয়ে চিহ্ন দিলে একই বইয়ে দুরকমের চিহ্ন হবে না।

অনেকে হয়তো বলবেন, পাঠকের সঙ্গে সম্বন্ধ তো পুস্তকের তালিকার। মঞ্চে বই-সাজানোর জন্যে তবে এত চিন্তা কেন ? আপনি যেভাবেই পুস্তকের জাতি-বিচার করুন না কেন, পাঠকের তা জানবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারে পাঠকের গতায়াতের বাঁধাবাঁধি নেই। মঞ্চ পাঠকের কাছে সব সময়েই খুলে দেওয়া হয়। যদি মঞ্চে পাঠকের যাবার অধিকার না-ও থাকে, তা-হলেও কোন একটি নিয়মানুসারে যে বই সাজানো প্রয়োজন, সে-কথা কেউই অস্বীকার করবে না। বইয়ের চিহ্নও একটি নিয়মানুসারে দিতে হবে। তা না হলে চাইবামাত্র বই খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হবে না। আবার যদি কোন পাঠক আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, গ্রন্থাগারে 'উদ্বাস্ত' সম্বন্ধে কি কি বই আছে, তা হলে তখন আপনি তাকে কি উত্তর দেবেন ? বিষয়ানুসারে বই সাজানো না থাকলে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

লেখক-সংখ্যা

বই তো বিষয়ানুসারে সাজানো হল, এখন একই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা বইগুলিকে কেমন করে পৃথক করতে হবে ? একই বিষয়ের মধ্যে আবার বিভাগ করতে গেলে এক-একখানি বইয়ের কোন একটি চরিত্র অনুসারে ভাগ করতে হবে।

এক বিষয়ের বইগুলিকে পৃথক পৃথক বিভাগে ভাগ করবার জন্যে যে-কোন সংখ্যা কাজে লাগানো যেতে পারে। এরূপ বিভাগের জন্যে বিষয়-সংখ্যার নীচে ০০০—৯৯৯ সংখ্যা ব্যবহার করা চলে। যেমন ধরুন, সাহিত্যের ইতিহাসের উপর দশখানি বই আছে। এই বই দশখানিকে চিহ্নিত করতে হলে এইরূপ চিহ্ন হবে: ৮০৯/০০১, ৮০৯/০১১, ৮০৯/১১১, ৮০৯/১১২, ৮০৯/১২২, ৮০৯/২২২, ৮০৯/২২৩, ৮০৯/২৩৩, ৮০৯/৩৩৩, ৮০৯/৩৩৪। এক বিষয়ের ২৭ খানি বইকে এইরূপ চিহ্নের দ্বারা সাজাতে পারা যাবে। বিভাগের প্রত্যেক ক্ষেত্রের চিহ্নের সঙ্গে এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে। এইরূপ চিহ্ন-ব্যবহারের আর একটি সুবিধা হচ্ছে, কোন্ বিষয়ে কতগুলি বই আছে, তা শীঘ্র জানা যাবে। কিন্তু বেশি বড় গ্রন্থাগারে এরূপভাবে চিহ্ন ব্যবহার করলে মুশকিল হতে পারে। কারণ, এরূপ গ্রন্থাগারে এক-একটি বিষয়ের বহু বই থাকতে পারে।

সাধারণতঃ লেখকের নামানুসারে বই সাজানো হয় এবং সেজন্য 'লেখক-সংখ্যা' ব্যবহার করা হয়। এইরূপ ছাপা লেখক-সংখ্যা কিনতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর প্রণীত 'লেখক-সংখ্যা' ব্যবহার করা চলে। এই বইখানি ইংরেজী 'লেখক-সংখ্যা'র অনুকরণে লিখিত।

ডাক-সংখ্যা

বইয়ের জাতিবিভাগের ফলে বইয়ের গায়ে একটি বিষয়-সংখ্যা পড়লো এবং লেখকের নামানুসারে বইয়ে আর একটি সংখ্যা পড়লো। প্রথম সংখ্যাটির নাম হল 'জাতি-সংখ্যা' বা 'বিষয়-সংখ্যা' এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটির নাম হল 'লেখক-সংখ্যা'। এই দুটি সংখ্যায় মিলে হয় 'ডাক-সংখ্যা'। কারণ, এই দুটি সংখ্যা দিয়ে পাঠক বইখানিকে "ডাক দেয়," অর্থাৎ চায়।

এই ডাক-সংখ্যাটি প্রথমতঃ বইয়ের নামের পাতার পিছন দিকে পেনসিলে লিখতে হয়। সময় সময় বইয়ের সংখ্যা পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই এই সংখ্যা পেনসিলে লেখা উচিত। বইয়ের গোড়ার দিকে অনেক সময় খালি পাতা থাকে। এই খালি পাতার উপর কখনও ডাক-সংখ্যা লেখা উচিত নয়। কারণ, বই বাঁধাবার সময় সেই পাতার পরিবর্তে নতুন কাগজ দেওয়া হয়। আর একটি ডাক-সংখ্যা দিতে হয় বইয়ের 'পুটে' বা শিরদাঁড়ায়। আর, বই খুব পাতলা হলে ডাক-সংখ্যা দেওয়া উচিত বইয়ের পিছনের মলাটের বাইরের দিকের উপরে—বাঁ কোণে।

কোন নতুন গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের জাতি-বিভাগ করতে হলে, প্রথমতঃ বইগুলিকে ডিউই'র বিভাগ অনুসারে দশটি ভাগে যেমন-তেমন করে সাজিয়ে নিতে হয়। তারপর ০ থেকে ৯ পর্যন্ত ক্রমশঃ সংখ্যা দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সংখ্যা দেবার আগে চিন্তা করে নিতে হয় যে, ডিউই'র সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত বিভাগ ব্যবহার করা হবে, অথবা ডিউই'র সংক্ষিপ্ত বিভাগ ব্যবহার করতে হবে। তবে পরিবর্ধিত বিভাগই ব্যবহার করা ভাল। কারণ, গ্রন্থাগার ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। সংক্ষিপ্ত বিভাগ ব্যবহার করলে সব বইকে শেষ পর্যন্ত স্থান না-ও দেওয়া যেতে পারে। তখন গ্রন্থাগারকে আবার নতুন করে গড়তে হয়। কিন্তু তা বড় কষ্টকর। বিভাগের ছক যতটা স্মরণ থাকে, সেই অনুসারে প্রথমতঃ বইগুলিকে মঞ্চে সাজিয়ে নেওয়ার একটা প্রধান সুবিধা হচ্ছে, ছক অনুসারে বিভাগ করবার পূর্ব থেকেই পুস্তকের একটি স্থান নির্ণয় করে নেওয়া হয়। এতে যিনি জাতি-বিচার করছেন, তাঁর স্মৃতিশক্তিরও একটা অনুশীলন হয়, এবং ছক সম্বন্ধে ধারণাও ক্রমশঃ গভীর হতে থাকে।

পুস্তক-তালিকা

স্কুল বা কলেজের পুস্তক-তালিকা করার সমস্যা বিশেষ কিছু নেই। সুতরাং তালিকা করার সাধারণ নিয়মগুলি মেনে চললেই কাজ মিটে যায়। স্কুলের গ্রন্থাগারের তালিকা করবার সময় মনে রাখতে হবে, স্কুলের ছাত্রদের গবেষণামূলক কোন কাজ করতে হয় না সুতরাং পুস্তক তালিকার জটিলতা এখানে যত কম হয় ততই ভাল এবং তালিকা যত কম বিশ্লেষণিক হয় তার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কলেজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে সব কলেজে গবেষণার কাজ হয় সে সব ক্ষেত্রে তালিকা যত বিশ্লেষণিক হয় ততই ভাল। বিষয় তালিকার উপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন কারণ গবেষকদের এবং কলেজের পাঠ তৈরি করবার জন্যে কোন বিষয়ের উপর কি কি লেখা আছে তা ছাত্রদের জানা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং স্কুল ও কলেজের তালিকা করার জন্য আমরা এখানে সাধারণ নিয়মগুলিই উল্লেখ করলাম।

জাতি-বিচার বনাম তালিকা-প্রণয়ন

বড় বড় গ্রন্থাগারে পুস্তকের জাতি-বিচারের ভার একজনের উপরই থাকে এবং তিনি এই বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হন। ছোটখাটো গ্রন্থাগারে জাতি-বিচারের কাজ ও তালিকা-প্রস্তুতের কাজ করেন একজনেই। অনেকে বলেন, এই দুটি কাজ পৃথক ব্যক্তির দ্বারা হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এ-দুটি কাজের মধ্যে একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এ-কথা সত্যি নয়। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, দুটি কাজের উদ্দেশ্য এক। যিনি পুস্তকের জাতি-বিচার করছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠক যাতে সহজে বই খুঁজে পায়, এক জায়গায় এক বিষয়ের বই দেখতে পায় এবং বিষয়গুলির ভিতরকার একটা সম্বন্ধ তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যিনি তালিকা প্রস্তুত করছেন, তাঁর উদ্দেশ্যও ঐ একই, অর্থাৎ তিনিও পুস্তকের 'লিখন' (entry) এমনভাবে তৈরি করছেন, যাতে একটি 'লিখন' দেখে পাঠক বইখানির বিষয় ও লেখকের নাম সম্বন্ধে সব কিছুই জানতে পারে। কেবল তাই নয়, জাতি-বিচারক বইখানির বিষয় কি ঠিক করলেন, তা-ও পুস্তকতালিকা প্রস্তুতকারকের জানা প্রয়োজন। তার কারণ, তাঁকেও বিষয়-লিখন লিখতে হবে। দুজনের মধ্যে একটা মতের

আদান-প্রদান থাকলে ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা কেউই প্রভাবান্বিত হতে পারবেন না। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জাতি-বিচারের কাজে ব্যক্তিগত প্রভাব অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এই সব নানাকারণে জাতি-বিচার যিনি করছেন, তাঁর সঙ্গে পুস্তকতালিকা-প্রস্তুতকারকের সম্বন্ধ যে অবশ্য থাকা চাই, একথাও মনে রাখতে হবে। জাতি-বিচারের সময় বইখানিকে জ্ঞানের যে ক্ষেত্রে ফেলা হয়েছে, সে-ক্ষেত্রের নাম যেন পুস্তকতালিকা-প্রস্তুতকারক বিষয়-লিখনে ব্যবহার না করেন। তাতে বইয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ না হতে পারে এবং ব্যবহৃত নামটি বোধগম্য না-ও হতে পারে।

পুস্তকের তালিকা-প্রণয়ন

তালিকার উদ্দেশ্য

সারা পৃথিবীতে কত বই যে ছাপা হয়, তার ঠিক নেই। কেবলমাত্র ইংরেজী বইই বছরে ১৬,০০০ ছাপা হয়। গ্রন্থাগারে বই কেনা হয়। কিন্তু বই কেনা হলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। কারণ, বইয়ের ব্যবহার না হলে বইয়ের কোন মূল্য থাকে না। পাত্র অনুসারে বইয়ের পরিবেশন না হলে বই কেনার উদ্দেশ্য সফল হয় না। নানা রকমের পাঠক নানারকম বিষয়ের নানা ধরনের বই নানাবিধ উদ্দেশ্যে পড়তে চায়। পুস্তকাগারে কি কি বিষয়ের কি ধরনের বই আছে, তা পাঠকদের প্রদর্শন করতে হবে। সেই কারণেই পুস্তক-তালিকার প্রয়োজন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে, পুস্তকের 'নামপত্র' লিখতে পারলেই পুস্তক-তালিকা তৈরি হয়ে গেল। পুস্তকাগারে প্রত্যেক বইই কোন-না কোন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে কেনা হয়। সেইজন্যে বইয়ের নাম ও লেখকের নাম লেখার সঙ্গে সঙ্গে বই কেনার উদ্দেশ্যও জানানো দরকার। বইখানি ছাপার উদ্দেশ্য, বইয়ের ভিতরের বিষয়-সূচী, সেই সকল বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বইয়ের বিষয়ের সম্বন্ধ—এ-সবই পুস্তকের তালিকা থেকে বোঝা যাওয়া চাই। তা না হলে অতি প্রয়োজনীয় বইও হয়তো কোন কাজে লাগবে না।

পুস্তকের তালিকা হচ্ছে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সম্ভারের চাবি। এই চাবি না থাকলে পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য সফল হয় না। পুস্তকতালিকা-বিহীন পুস্তকাগারকে বইয়ের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। পাঠকের যদি পুস্তকাগারের রত্ন-সম্ভারের সন্ধান জানবার প্রয়োজন হয়, তা হলে পুস্তক-তালিকার যে প্রয়োজন আছে, সে-কথা কেউই অস্বীকার করবে না।

পুস্তক-তালিকার কাজ কি? তালিকার কাজ হচ্ছে নিম্নরূপ চারটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া :

(১) এই লেখকের কি কি বা কখানি বই আছে?

(২) এই বিষয়ের কি কি বা কখানি বই আছে?

(৩) এই নামে কোন বই আছে কিনা?

(৪) এই সিরিজের কতগুলি বা কি কি বই আছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় লেখকের নামের তালিকা থেকে;

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় বিষয়ের তালিকা থেকে;

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় পুস্তকের নামের তালিকা থেকে; এবং

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সিরিজের তালিকা থেকে।

তালিকার বিভিন্ন রূপ

তাহলে পুস্তকের তালিকায় থাকা চাই : (১) লেখকের নাম, (২) বিষয়ের নাম, (৩) বইয়ের নাম ও (৪) সিরিজের নাম।

'লেখক' কথাটির পরিবর্তে 'প্রণেতা' কথাটাই ব্যবহার করা ভাল। কারণ, কেবল লেখকই যে পুস্তকের সৃষ্টিকর্তা, তা নয়। কোন সম্পাদকের সম্পাদনায় একখানি পুস্তকের সৃষ্টি হতে পারে; সংকলন করেও একখানা পুস্তক সৃষ্টি করা যেতে পারে, আবার কোন সঙ্ঘের দ্বারাও একখানি বই প্রকাশিত হতে পারে। সেই কারণে 'লেখক' বলতে আমরা বুঝবো 'পুস্তক-প্রণেতা'কে।

প্রণেতার নামের তালিকা এমনভাবে তৈরি করা চাই, যাতে নামের আদ্য-ক্ষরের ক্রমানুসারে পুস্তক-প্রণেতার নামগুলি পর পর স্থান পায় এবং এক প্রণেতার যতগুলি বই থাকে, সে-সমস্ত বইয়ের নামই এক স্থানে দেখা যায়। এইরূপ তালিকা হলে কোন পুস্তক-প্রণেতার বিশেষ কোন একখানি বই সহজে খুঁজে বার করা যাবে এবং একজন প্রণেতার কি কি বিষয়ের কতগুলি বই আছে, তা-ও সহজে জানা যাবে।

এক-একটি বিষয়ের বইয়ের লিখন এক স্থানে থাকা চাই এবং বিষয়ের তালিকার মধ্যে বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তভাবে সাজানো দরকার। একখানি বইয়ে অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধে লেখা থাকতে পারে। সে কারণে তালিকায় প্রত্যেক বিষয়ের এক একটি 'লিখন' (entry) থাকা চাই।

তালিকার মধ্যে বইয়ের নামের 'লিখন' বড় একটা থাকে না। তবে যে-সব

বইয়ের নামটা অদ্ভুত এবং যে-বইয়ের লেখকের নামের চেয়ে বইয়ের নামই সাধারণের বেশি মনে থাকে, সেই-সব নাম লিখনের দ্বারা তালিকাভুক্ত করা দরকার।

প্রত্যেক লিখনে বইয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকা চাই: লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশের তারিখ, প্রকাশক, কোথায় প্রকাশিত হয়েছে, ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এমন কোন পুস্তকাগার নেই, যেখানে একটি মাত্র পুস্তক-তালিকা দ্বারা পূর্বোক্ত চারটি প্রশ্নেরই উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

কোন পুস্তকাগারে কি রকম তালিকা থাকা দরকার, সেইটাই হল পুস্তকাগারের সমস্যা। কারণ, কি ধরনের পুস্তক-তালিকা রাখা হবে, তা নির্ভর করবে কি ধরনের পাঠক, তার উপরে। পাঠকেরা যদি অতি সাধারণ হয়, অর্থাৎ যারা কেবল আনন্দের জন্যই বই পড়তে চায় এবং যারা কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নয়, তা হলে তাদের জন্যে একটি লেখক-তালিকা করলেই হয়তো চলে। কিন্তু সাধারণ পুস্তকাগারের পাঠক যে কত রকমের হয়, তা বুঝে ওঠাও কঠিন। সেই কারণে কেবল লেখক-তালিকার উপর নির্ভর করলেও চলে না। কোন পাঠক বইয়ের লেখকের নাম ভুলে গেলে, সে তার প্রয়োজনীয় বইখানির সন্ধান আর পাবে না। কিন্তু কি বিষয় সে পড়তে চায়, তা তার জানা থাকা দরকার। কারণ, তা-ও যদি তার মনে না থাকে, তা হলে বলতে হয়, তার পড়বার উদ্দেশ্য যে কি, তা সে নিজেই জানে না। সেই জন্যে বিষয়-তালিকা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। যে-কোন পুস্তকাগারে একটি বিষয়-তালিকা ও সেই সঙ্গে একটি লেখক-সূচী থাকলেই ভালভাবে কাজ চলবে, আশা করা যায়।

লেখক-তালিকা: কিছুকাল আগেও লেখকের তালিকা ছিল পুস্তকাগারের সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তালিকা। স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারে লেখকের তালিকাকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তালিকা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, একটি বিষয়ের 'ইঙ্গিত' দিতে গেলে নানা নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। বইয়ের নামও অনেক সময় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না, বা পাঠক নিজে বইয়ের নাম যথাযথভাবে মনে না রাখতেও পারে। কিন্তু লেখকের নাম সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। অন্ততঃ লেখকের নামটি পাঠকের মনে থাকা চাই। তবে অনেক সময় লেখক 'অপ্রকৃত' নাম অর্থাৎ ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন, বা কেবল নামের প্রথম অক্ষরও ব্যবহার করতে পারেন, আবার নামের উপাধি-

পরিবর্তনও করতে পারেন। যেমন, বিবাহের পর স্ত্রীলোকের নামের উপাধির অংশের অনেক সময় পরিবর্তন হয়। এ-সব ক্ষেত্রে আসল নাম, অপ্রকৃত নাম, পরিবর্তিত নাম, নামের আদ্যক্ষর—সমস্তই লিখনের দ্বারা তালিকাভুক্ত হওয়া দরকার।

বিষয়-তালিকাঃ সত্যিকথা বলতে গেলে, বিষয়-তালিকা বলতে যে কি বোঝায়, তা বর্ণনা করা শক্ত। কারণ, বর্ণমালা অনুসারে বিষয়-তালিকা প্রস্তুত করলে বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। যেমন ধরুন, সমাজ-তত্ত্ব, রাজনীতি, শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য—এই বিষয়গুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। একটি শিখতে গেলে আর একটি শেখা দরকার। কিন্তু এই বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাতে গেলে একটি বিষয় থেকে আর একটি অনেক দূরে গিয়ে পড়বে। তার ফলে পুস্তকের তালিকার মধ্যে বিষয়গুলির কোন সম্বন্ধ দেখানো যাবে না। বিষয়-তালিকা দুই রকমেরঃ (ক) বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী তালিকা ও (খ) বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক তালিকা।

(ক) **বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী তালিকা**ঃ পুস্তকের জাতি-বিভাগ করতে হবে জ্ঞানের জাতিবিভাগ অনুসারে। প্রথমে জ্ঞানের জাতিবিভাগের একটি ছক করে নিতে হবে। জ্ঞানের জাতিবিভাগের ছকে বিষয়গুলি যেমন পরস্পরের সম্বন্ধ অনুসারে সাজানো আছে, পুস্তকের বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী তালিকাকে ঠিক সেই নিয়মে সাজাতে হবে। জ্ঞানের জাতি-বিভাগের তালিকাটি যত ভাল হবে, বিষয়-তালিকাও তত ভালভাবে প্রস্তুত করা যাবে। জ্ঞানের জাতিবিভাগের ছক অকেজো হয়ে গেলে বিষয়-তালিকাও অকেজো হয়ে পড়বে। বই-সাজানোর জন্যে জ্ঞানের জাতিবিভাগের যতখানি মূল্য, বিষয়-তালিকার মূল্যও ঠিক ততখানিই। প্রত্যেক বইয়ের 'লিখন'টিকে যদি এক-একখানি বই বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে এই তালিকাটিকে গ্রন্থাগারের একটি ছোটখাটো প্রতীক বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ, গ্রন্থাগারে বইগুলি যেমন দলবদ্ধভাবে সাজানো আছে, এই তালিকায় বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলিও সেই একই রূপে সাজানো হবে। কেবল তফাত এই যে, একখানি বইয়ের জন্য একটির বেশি 'লিখন' থাকতে পারে। কারণ, একটি বইয়ের ভিতর যতগুলি বিষয় আছে, সবগুলিরই একটি করে 'লিখন' দরকার। যেমন ধরুন, একখানি প্রবন্ধের বই। এই বইয়ের ভিতর দশটি বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ আছে। দশটি বিষয়ের কথা যে সেই বইখানিতে আছে, সে-কথা পাঠকদের জানতে দেওয়া দরকার। তা না হলে বিষয়গুলির খোঁজ পড়বে না।

ছোটখাটো গ্রন্থাগারে এইরূপ তালিকা তৈরি করার প্রয়োজন বেশি। কারণ, পাঠক কিছু পড়তে চাইলে তাকে অন্ততঃ তার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কিছু পড়তে দিতে হবে। একটি ছোটখাটো পুস্তকাগারে সব বিষয় সম্পর্কে পৃথক পৃথক বই না থাকতেও পারে। উপরের মত তালিকা প্রস্তুত করলে পাঠককে তবু হতাশ হয়ে ফিরতে হবে না। পাঠক যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু পড়তে এসে তালিকায় তা খুঁজে না পায়, তা হলে সে আর পুস্তকাগারের দরজা মাড়াবে না। এই তালিকা প্রস্তুত করবার সময় আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। একটি বিষয় নানা নামে পরিচিত হতে পারে। যে-নামটি সব চেয়ে বেশি পরিচিত, সেই নামটিতে হবে প্রধান 'লিখন' এবং অন্য নামগুলি থেকে সেই প্রধান লিখনে 'সম্বন্ধ নির্দেশ' করে দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আরো কথা আমরা পরে বলবো।

(খ) **বিষয়ের জাতিবিভাগ-অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক তালিকাঃ** এই তালিকায় প্রথমতঃ বর্ণমালার যতগুলি অক্ষরে সম্ভব, জ্ঞানের ক্ষেত্রকে ততগুলি ভাগে ভাগ করে নিয়ে, ক্ষেত্রগুলির নাম বর্ণমালা অনুসারে সাজিয়ে প্রত্যেক নামের নীচে, সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাতে হয়।

লেখক, বিষয়, বইয়ের নাম ও সিরিজের তালিকাগুলিকে একত্রিত করে একটিমাত্র 'অভিধান-তালিকা' প্রস্তুত করা যেতে পারে।

কোন একটি বিষয় খুঁজে বার করবার দরকার হলে, এই ধরনের তালিকা খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কেউ যদি কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের বই এক সঙ্গে দেখতে চায়, তা হলে এতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তবে এক বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের 'সম্বন্ধ নির্দেশ করে' অভিধান-তালিকার এই ত্রুটিটুকু দূর করা যায়। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এই 'সম্বন্ধ-নির্দেশ' ক্রমশঃ বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।

তালিকার গঠন

তালিকার গঠন সাধারণত দুরকমেরঃ (১) কার্ড-তালিকা ও (২) বই-তালিকা। কোন্ প্রকারের তালিকা পুস্তকাগারে রাখতে হবে, তা ঠিক করবার আগে তালিকার নিম্নে বর্ণিত বিশেষ চরিত্রগুলি ভেবে দেখতে হবেঃ

(ক) তালিকা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে। কারণ, পুস্তকাগারের বইয়ের সংখ্যা রোজই বাড়বে এবং প্রতি বইয়ের জন্যে নতুন লিখন লিখতে হবে। এই কারণে তালিকার একটি চরিত্র হচ্ছে সম্প্রসারণশীলতা।

(খ) তালিকা 'সময়োপযোগী' হওয়া চাই, অর্থাৎ নতুন বই যেমন পুস্তকাগারে আসতে থাকবে, তেমনি বই আসার সঙ্গে সঙ্গে তালিকাতেও নতুন বইয়ের লিখন ওঠা চাই।

(গ) এক রকমের লিখন এক সঙ্গে থাকা চাই।

(ঘ) বই বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে তালিকার লিখনও বাতিল করা সম্ভব হওয়া চাই।

(ঙ) তালিকা যাতে সহজে ব্যবহার করা যায়, তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(চ) পাঠক অনেক সময় তালিকা বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। সে জন্যে তালিকা বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

এই তো গেল তালিকার চরিত্র। এখন দেখুন, উল্লিখিত ত্বরকমের তালিকার মধ্যে কোন্‌টিতে বেশির ভাগ চরিত্র বর্তমান।

কার্ড-তালিকা

প্রত্যেক বইয়ের 'লিখন' একখানি ৫" × ৩" মাপের কার্ডে লেখা হয়। পরে কার্ডগুলি যে-কোন নিয়মানুসারে একটি ট্রে'র ভিতর সাজিয়ে রাখা হয়। ট্রেগুলি একটি সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করান থাকে। প্রত্যেক কার্ডের তলার দিকে একটি ছিদ্র থাকে। একটি লোহার শিক ট্রে'র বার থেকে ট্রে'র মধ্যে পর পর সাজানো কার্ডগুলির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ট্রে'র অপর প্রান্তে আটকে রাখা হয়।

কার্ড-তালিকার গুণাগুণ : কার্ড-তালিকার সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে :

(ক) কার্ড-তালিকার সম্প্রসারণ সহজে করা যায়। কারণ, কার্ডগুলিকে ট্রে'র ভিতর ইচ্ছামত সরান যায়।

(খ) কার্ড-তালিকাকে সময়োপযোগী করে রাখা যায়। কারণ, নতুন লিখনের একখানি কার্ডকে ট্রে'র মধ্যে সহজে স্থান দেওয়া যায়।

(গ) প্রত্যেক লিখন ইচ্ছামত সরানো যায়। সেই জন্যে একজাতীয় লিখন একসঙ্গে রাখার কোন অসুবিধা হয় না।

(ঘ) কার্ড-তালিকা সর্বদা 'সহজলভ্য' নয়। কারণ, একজন যখন কোন একটি বিষয় খোঁজে, তখন আর একজনের পক্ষে অন্য ট্রে খোঁজা অসুবিধাজনক হয়। তবে একটি স্থানে কার্ডের সিন্দুকটিকে রাখা হয় বলে পাঠককে একটি বিষয় খোঁজবার জন্যে দশ জায়গায় যেতে হয় না।

(ঙ) ট্রেগুলি সহজে বহনসাধ্য নয়। সেই কারণে ট্রেগুলি কারো পক্ষে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বই-তালিকা

বই-তালিকা দুই প্রকারের: (ক) ছাপা তালিকা ও (খ) 'শীফ' (sheaf) তালিকা। ছাপা তালিকার কথা পরে বলবো। 'শীফ' তালিকার কথা আগে বলছি।

'শীফ' তালিকার গুণাগুণ: (১) 'শীফ' তালিকায় প্রত্যেকটি লিখন একখানি নির্দিষ্ট মাপের কাগজের উপর লেখা হয় বলে 'শীফ' তালিকার সম্প্রসারণ সম্ভবপর, তবে খুব বেশি সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর নয়। তার কারণ, নির্দিষ্ট মাপের আকারবিশিষ্ট একটি আবরণ বা মলাটের মধ্যে কাগজগুলিকে আটকে রাখা হয় এবং এই আবরণের মধ্যে যতগুলি কাগজ ধরবার জায়গা আছে, তার চেয়ে বেশিসংখ্যক কাগজ ধরানো সম্ভবপর নয়।

(২) 'শীফ'তালিকা বইয়ের মত আকারের বলে তা একস্থান থেকে আর একস্থানে সহজে নিয়ে যাওয়া যায়।

(৩) প্রত্যেক পাতায় অনেকটা লেখবার জায়গা থাকে, সে কারণে অনেক সময় একটি পাতায় একাধিক লিখন লেখা হয়। তার ফলে কিছুদিন পর লেখাগুলি বড় বেশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে পড়ে।

(৪) কোন লিখন নষ্ট করবার প্রয়োজন হলে একখানি পুরা পাতা নষ্ট করতে হয় বলে প্রত্যেক পাতা আবার নতুন করে লিখতে হয়।

আজকাল ইংরেজী বইয়ের ছাপা লিখন অল্প মূল্যে কিনতে পাওয়া যায়। সেই লিখনগুলিকে কার্ডের উপর আঠা দিয়ে এঁটে ট্রে'র ভিতর রাখা যতটা সুবিধাজনক হয়, একটি পাতার উপর সেই লিখন এঁটে 'শীফ'-এর ভিতর রাখা ততটা সুবিধাজনক নয়। কারণ, তার ফলে 'শীফ' তালিকা ক্রমশঃ ফুলে ওঠে।

ছাপা ও হাতে লেখা তালিকা

ছাপা তালিকার উপর চিরকাল সাধারণের একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু আজকাল ছাপা তালিকার আর চলন নেই। কারণ, তালিকা ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তা আর সময়োপযোগী থাকে না এবং নতুন বইয়ের লিখনকে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। উপরন্তু তালিকা ছাপার খরচ অনেক। তা ছাড়া, অর্থব্যয়

করে অকেজো তালিকা রাখার কোন অর্থ হয় না। সে কারণে হাতে লেখা তালিকার চলনই এখন বেশি।

পুস্তকের জাতি-বিভাগের সঙ্গে তালিকার সম্বন্ধ

জাতি-বিভাগের ফলে আমরা একখানি বইকে একটিমাত্র স্থান দিতে পারি। বইয়ের অন্তর্নিহিত বিষয় বহু হওয়া সব সময়েই সম্ভব। ধরুন, একখানি প্রবন্ধের বই। এইবইটির ভিতর বিভিন্ন বিষয়ের দশটি রচনা থাকতে পারে। বইখানিকে খুলে দশটি ভাগে বিভক্ত করে দশটি স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পুস্তকাগারে একখানির স্থানে দশখানি বই কেনাও সম্ভবপর নয়। কিন্তু বইখানির ভিতর যে দশটি বিষয় আছে, তা পাঠককে জানতে দেওয়া দরকার। তা না হলে, বইয়ের বিষয়গুলির খোঁজ পড়বে না এবং বিষয়গুলির খোঁজ পাওয়াও সহজসাধ্য হবে না। বইখানির লিখনে বিষয়ের স্থচী তো দিতেই হবে, তা ছাড়া যতগুলি বিষয় আছে, তালিকার ভিতর ততগুলি লিখন রাখতে হবে। এই কারণে তালিকাকে বলা হয় পুস্তকের জাতি-বিভাগের পরিপূরক।

যে-কয়েক প্রকারের পুস্তকতালিকার কথা আমরা বললাম, সেগুলি সবই সাধারণের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু কোন সময় গ্রন্থাগারে কত বই আছে, তা জানবার প্রয়োজন হলে, কি দেখে তা বুঝতে পারা যাবে? লেখকের বা বিষয়ের তালিকা দেখে তা বোঝা যাবে না। কারণ, পুস্তকাগারের বইয়ের সংখ্যা অপেক্ষা তালিকায় লিখনের সংখ্যা অনেক বেশি। স্থতরাং পুস্তকাগারে সঞ্চিত সব বইয়ের হিসাব নিতে গেলে কেবল ঐ তুইটি তালিকার উপরই নির্ভর করা চলে না। উপরন্তু তালিকার সঙ্গে সঞ্চিত বইগুলি মেলাবেন কি করে? লেখকের তালিকার সঙ্গে বই মেলানো কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কারণ, বই সাজানো থাকে পুস্তকের জাতি-বিভাগের তালিকা অনুসারে, আর লেখকের তালিকা সাজানো থাকে বর্ণমালা অনুসারে। তবে বিষয়ের তালিকার সঙ্গে সঞ্চিত বইগুলি মেলানো কতকটা সম্ভবপর হতে পারে। কারণ, বিষয়ের তালিকা পুস্তকের জাতিবিচারের তালিকা অনুসারে সাজানো থাকে। কিন্তু তাতে লিখনের সংখ্যা অনেক বেশি বলে বিষয়ের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে সঞ্চিত বইয়ের রাশির হিসাব নেওয়া বিশেষ স্থবিধাজনক নয়।

মঞ্চ-তালিকা

মজুত বইয়ের হিসাব নেওয়ার জন্য মঞ্চ-তালিকা রাখা হয়। পুস্তকের জাতিবিচারের তালিকা অনুসারে গ্রন্থাগারে মঞ্চের উপর বই সাজিয়ে রাখা হয়।

প্রত্যেক বইয়ের একটি করে লিখন-সমেত একটি তালিকা রাখতে হয়। এই তালিকার দ্বারা মজুত বই মেলাবার সুবিধা হয়। কারণ, বই যেমনভাবে সাজানো আছে, লিখনগুলিও ঠিক তেমনিভাবেই সাজানো থাকে। বই মেলাবার সময় পুস্তক-মঞ্চে গিয়ে, একজন এক-একখানি বইয়ের নাম ডাকতে থাকবে, আর একজন লিখনের সঙ্গে বই মিলিয়ে যাবে। যে বইখানি পাওয়া যাবে না, সে বইখানির লিখনের উপর একটি × চিহ্ন দিলেই যথেষ্ট। পরে × চিহ্নগুলি গুনে নিলেই বোঝা যাবে, কতগুলি বই গ্রন্থাগারে নাই।

মঞ্চ-তালিকার সুবিধা: মঞ্চ-তালিকার আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয়তা আছে:

(১) এই তালিকা সঞ্চিত পুস্তকের সংখ্যা নির্দেশ করে বলে এই তালিকার উপর নির্ভর করে পুস্তক-সম্ভারের বীমা হয়।

(২) এই তালিকা থেকে যখন খুশি কোন একজাতীয় পুস্তকের তালিকা ছাপানো সুবিধাজনক হয়ে থাকে।

(৩) কোনো বিষয়ের পুস্তক-সংগ্রহের মূল্যের পরিমাণ কত, তা সহজেই বোঝা যায়।

(৪) কোনো বিষয়ের নতুন একখানি বই এলে সে বইখানি গ্রন্থাগারে আছে কিনা, তা সহজেই জানা যায়।

(৫) একই বইয়ের দুইটি নম্বর হয়ে গেল কিনা, মঞ্চ-তালিকার সাহায্যে তা-ও নির্ধারণ করবার সুবিধা হয়।

অনেকে হয়তো বলবেন, মঞ্চ-তালিকা থাকলেই তো হল, বিষয়-তালিকার আবার প্রয়োজন কি? কথাটা নেহাত বাজে নয়। কারণ, মঞ্চ-তালিকা ও বিষয়-তালিকা প্রায় এক। কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, মঞ্চ-তালিকার যা-কিছু প্রয়োজন, তা পুস্তকাগারের কর্মীদের কাছে। বই সম্বন্ধে কর্মীদের যতটুকু প্রয়োজন, মঞ্চ-তালিকার লিখনে কেবল ততটুকুরই উল্লেখ থাকে। যেমন— লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম, বইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম, বই প্রকাশের তারিখ, প্রত্যেক বইয়ের ডাক নম্বর (বিষয়-সংখ্যা+পুস্তকসংখ্যা), প্রবেশ-সংখ্যা (ক্রমিক সংখ্যা) এবং পুস্তক কয়খণ্ডে সম্পূর্ণ ও কয়খানি পুস্তক আছে, তার সঙ্কেত।

বিষয়-তালিকার লিখনে পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় আরও অনেক বেশি থাকে। যেমন ধরুন: বইয়ের কত পাতা, ছবি আছে কিনা, বইয়ের আকার, বিষয়-সূচী, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিষয়-তালিকায় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ-

নির্দেশের লিখন, দুইটি সমার্থক বা বিপরীতার্থবাচক নামের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়ের লিখন এবং আরো নানাবিধ লিখন থাকে।

এইসব কারণে মঞ্চ-তালিকার সঙ্গে বিষয়-তালিকার আংশিক মিল থাকলেও উভয় তালিকা সম্পূর্ণ এক নয় এবং একটির কাজ অপরটিকে দিয়ে চলে না।

পুস্তকের তালিকা পাঠকদের জন্যে বহু কষ্টে ও বহু খরচ করে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, পাঠকেরা বই নেবার আগে তালিকা বড় একটা খুঁজে দেখে না। বইয়ের তালিকার প্রয়োজন আছে, একথা কেউই অস্বীকার করবে না। তবে কোন্ তালিকা রাখলে, সেই তালিকা রাখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তা নির্ভর করবে গ্রন্থাগার কি জাতীয়, তার উপর।

গ্রন্থ-তালিকা ও পাঠক : গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলেই যে গ্রন্থতালিকার কাজ শেষ হয়ে গেল, এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন। গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হল পাঠকের জন্যে। এখন দেখতে হবে, পাঠক তা ব্যবহার করে কি না। তালিকার ব্যবহার যদি না হয়, তা হলে তালিকা প্রস্তুত করার কোন সার্থকতা থাকে না।

গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ দেখা যায়, তালিকা থাকা সত্ত্বেও তা পাঠকেরা ব্যবহার করে না। একশ' জনের মধ্যে নয় জনও গ্রন্থতালিকা ব্যবহার করে কিনা সন্দেহ। অথচ পাঠকের গ্রন্থতালিকা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কারণ, কিরূপ বই পড়লে নিজের চাহিদা মিটবে, তা পাঠক যতটা বুঝবে, আর কেউই ততটা বুঝবে না।

পাঠকরা যে তালিকা ব্যবহার করে না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তারা জানে না কেন তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তালিকার ভিতরে কি আছে, এবং কেমন করে তা ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দেশের স্কুলের ও কলেজের গ্রন্থাগারে মঞ্চের ভিতর পাঠকের প্রবেশাধিকার নেই। প্রবেশাধিকার থাকলে কিন্তু তালিকা-ব্যবহারের সমস্যার সমাধান করা আরো দুরূহ হয়ে পড়তো। তার কারণ, পাঠক পুস্তক-মঞ্চকেই চিনতো বেশি, তালিকার ধার তারা ধারতো না।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আধুনিক গ্রন্থাগারে পুস্তকের তালিকা সাধারণতঃ দুরকমের : লেখক-তালিকা ও বিষয়-তালিকা। লেখকতালিকা-ব্যবহারে বিশেষ মুশকিল নেই এবং বিশেষ করে পাঠ্যতালিকা যদি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, তাহলে পাঠককে এইটুকু জানাবার ব্যবস্থা করলেই চলবে যে, লেখকের নামে বইখানি খুঁজতে হবে। ভারতীয় লেখকের নাম তাঁর মূল নামে খুঁজতে হবে, উপাধি দিয়ে

খুঁজলে চলবে না। যেমন—শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' খুঁজতে হলে, 'চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র' নামে না খুঁজে, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'-নামে বইখানি খুঁজতে হবে। কিন্তু বিদেশী নাম হলে নামের শেষাংশ দিয়ে উদ্দিষ্ট বই খুঁজতে হবে। যেমন 'John Milton'-এ না খুঁজে, বই খুঁজতে হবে 'Milton, John'-এ। একথাও পাঠকদের জানিয়ে দিতে হবে যে, প্রত্যেক কার্ডে একখানি মাত্র বইয়ের বিবরণ দেওয়া আছে। কার্ডগুলি একটির পর একটি দেখবার সময় কার্ডগুলিকে সরাতে হবে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ধারের দিক থেকে, উপরের দিক থেকে নয়। সময় সময় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, পাঠক কিভাবে পুস্তক-তালিকা ব্যবহার করছে, এবং সময় সময় দেখিয়েও দিতে হবে, কেমন করে পুস্তক-তালিকা ব্যবহার করতে হয়।

লেখকের নাম বহু রকমের হতে পারে। কোন সঙ্ঘের প্রকাশিত বই, গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বই—এ-সব বই কেমন করে খুঁজতে হবে, তাও পাঠককে জানাতে হবে। যেমন ধরুন, India Government-এর প্রকাশিত বই 'India' দিয়ে খুঁজতে হবে, Royal Asiatic Society of Bengal—গোড়াকার কথার প্রথম অক্ষরে খুঁজতে হবে। অবশ্য এ-সব ক্ষেত্রে Govt. ও Bengal দিয়ে খুঁজলেও পাঠক বইয়ের সন্ধান পাবে, কিন্তু তাতে তাকে খুঁজতে হবে বেশি।

পাঠক যেখানে লেখকের নাম জানে, সেখানে মুশকিল বিশেষ কিছু নেই। পাঠকের যদি কেবল বইয়ের নাম মনে থাকে, তা হলেও তাকে জানিয়ে দিলেই হল যে, বইয়ের নামের গোড়াকার অক্ষরে দেখলেই চলবে। কিন্তু যেখানে পাঠকের বইয়ের নামও মনে নেই, লেখকের নামও মনে নেই, কেবল সে কি বিষয় পড়তে চায়, এইটুকু মাত্র সে জানে, সেখানে সমস্যা কঠিন। কারণ, বিষয়-তালিকা একটু গোলমেলে ব্যাপার। বিষয়-তালিকা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয় না, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। অবশ্য বর্ণানুক্রমিকভাবে অভিধানের মত বিষয়-তালিকা সাজালে একদিকে সমস্যার সমাধান হলেও, বিষয়-তালিকার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ, তাতে বিষয়গুলির পরস্পরের সঙ্গে ধারাবাহিক সম্বন্ধ দেখানো হয় না। সেইজন্যে আমাদের বিষয়-তালিকা সাজাবার নিয়মটা পাঠককে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। 'শিশু-মন' সম্বন্ধে কোন বই খুঁজতে হলে বইখানিকে মনস্তত্ত্বের মধ্যে খুঁজতে হবে এবং মনস্তত্ত্ব যে দর্শনের একটি অংশ, একথাও পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে একথাও জানাতে হবে যে, কার্ডগুলি সাজানো হয়েছে কার্ডের বাঁদিকে লেখা সংখ্যা অনুসারে। সুতরাং

কোন্ বিষয়ে কি বই গ্রন্থাগারে আছে, তা জানতে হলে সেই বিষয়ের সংখ্যাটি জানতে হবে। এসব বিষয় জানাতে হলে আমাদের বিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত ছক তালিকার দেরাজের উপর রাখা প্রয়োজন।

নিম্নের ছক-অনুযায়ী একটি বর্ণনা রাখলে কাজ চলে :

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর	**দেখ**
গ্রন্থাগারে এমন কি বই আছে, যার—	
(১) লেখকের নাম জানা আছে ?	লেখকতালিকায় লেখকের নামে দেখ।
(২) বিষয় জানা আছে ?	বিষয়তালিকায় বিষয়ের নামে দেখ।
(৩) বইয়ের নাম জানা আছে	বইয়ের নামের তালিকায় নামের গোড়ার অক্ষর অনুসারে দেখ।
গ্রন্থাগারে কি বই আছে—	
(৪) কোন্ বিষয়ে ?	বিষয়-তালিকায় বিষয়ের নামে দেখ।
(৫) কোন্ লেখকের ?	লেখক-তালিকায় লেখকের নামে দেখ।
(৬) কোন্ লোক সম্বন্ধে ?	লোকের নামে দেখ।
(৭) কোন্ সিরিজের বই ?	সিরিজের নামে দেখ।

এ ছাড়া আরো অনেক উপায় আছে। কিন্তু স্থানাভাবে এখানে সে-সব কথা বলা চলে না।

তবে মনে রাখতে হবে, পাঠক যেন কোন বইয়ের খোঁজে তালিকা দেখার পূর্বে গ্রন্থাগারিকের কাছে বা গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে না আসে এবং এলেও তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তালিকা থেকে তার বই খুঁজে বার করে দেওয়া দরকার। তাতে পাঠকেরও তালিকা ব্যবহার করতে শেখা হয় এবং গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও কাজ অনেকটা হালকা হয়।

সংক্ষিপ্ত তালিকা

আজকালকার গ্রন্থাগারে কত রকমের বস্তু যে আসে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু গ্রন্থাগারকে সবই যদি তালিকাভুক্ত করে তুলে রাখতে হয়, তা হলে স্থানাভাবের সমস্যা শীঘ্রই দেখা দেবে, অথচ গ্রন্থাগার ভর্তি হয়ে যাবে কতকগুলি বাজে কাগজপত্র আর বইয়ে।

সেই জন্যে আজকালকার গ্রন্থাগারে সব কিছুই তালিকাভুক্ত করা হয় না। সব জিনিসই যদি লিখিতভাবে তালিকাভুক্ত করা যায়, তা হলে পুস্তক-তালিকার

কলেবরও ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে, অথচ গ্রন্থাগার ভরা থাকবে যত অকেজো লিখিত ও মুদ্রিত বস্তুর স্তূপে।

যে-সকল লিখিত ও মুদ্রিত বস্তুকে লেখক-তালিকার মধ্যে রাখার প্রয়োজন হয় না, সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

(১) গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বলে যে-সব বই গ্রন্থাগার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ;

(২) যে-সব জিনিস গ্রন্থাগারে রেখে দেওয়া হয়, অথচ তালিকাভুক্ত করা হয় না ;

(৩) পুস্তিকা ও পুস্তিকার মত অল্পপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস।

এরূপ পুস্তিকাসমূহকে তালিকাভুক্ত করতে হয় একটি মাত্র শীর্ষকে।

পুস্তিকা সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা : পুস্তিকা অর্থাৎ কোন বিষয়সম্বন্ধীয় এরূপ ছোটখাটো অল্পপ্রয়োজনীয় চটি বইগুলি একটি কাগজের বাক্সের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভুক্ত বইয়ের দলের শেষে রাখতে হয়। একসঙ্গে রাখার বিপদ আছে। কারণ, ভারী বইয়ের চাপে পুস্তিকাগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এমন অনেক পুস্তিকা থাকতে পারে, যার খোঁজ পড়তে পারে লেখকের নামে। সে-সব ক্ষেত্রে পুস্তিকাকে সাধারণ বই হিসাবে ধরে নিয়ে লেখকের নামে একখানি কার্ড করা প্রয়োজন।

যে-সব বই বা পুস্তিকা অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে সেগুলির লেখক-তালিকা ও বিষয়-তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেওয়া সাধারণতঃ সম্ভবপর নয়। তার কারণ, তালিকা কিরূপ হবে—না হবে, তা নির্ভর করবে গ্রন্থাগার ও পাঠকের উপর। কেবল সংক্ষিপ্ত তালিকার দ্বারা অনেক সময়-সংক্ষেপ করা যায় এবং তালিকার কলেবরও মিছামিছি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না।

অনেকেই গ্রন্থাগারে বই দান করেন। দান হিসাবে প্রাপ্ত বই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরনো হয়ে থাকে এবং গ্রন্থাগারে যে-সব বইয়ের নতুন সংস্করণ থাকবে, সে-সব বইয়ের পুরাতন সংস্করণ আরো দু-এক কপি রেখে কোনো লাভ নেই। কারণ, সে-সব বই অচল। পাঠক যখন নতুন সংস্করণের বই চাইবে, তখন তাকে পুরাতন সংস্করণের একখানি বই বার করে দেওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই এবং ঠিক এই কারণেই আজকালকার গ্রন্থাগার থেকে মাঝে মাঝে অকেজো বই বাতিল করার প্রয়োজন হয়।

সংক্ষিপ্ত তালিকার সুবিধা-অসুবিধা ঃ সংক্ষিপ্ত তালিকাপ্রকরণের ভালোমন্দ দুটি দিকই আছে। পাঠকের জন্যই যখন তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তখন কোন্ বইখানির সম্পূর্ণ তালিকা করতে হবে, আর কোন্ কোন্ বইয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা করলে চলবে, তা নির্ণয় করা কঠিন। সে-ক্ষেত্রে ভুল হওয়া খুবই সম্ভব, তবে সংক্ষিপ্ত তালিকার ভালোর দিকটা বিবেচনা করলে, উপরের ঝুঁকিটুকু নেওয়া যে বিশেষ অসঙ্গত হবে, তা মনে হয় না।

আমাদের দেশে স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারে একমাত্র গ্রন্থাগারিক ছাড়া কাজ করবার লোক আর থাকে না। এই গ্রন্থাগারিককে একাই সব কাজ করতে হয়। তাকে যদি প্রত্যেক বইখানির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করতে হয়, তা হলে তার আর কোনো কাজ করবার সময় থাকে না। অথচ তার আরো অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করবার আছে, যেমন ঃ পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, পাঠককে প্রার্থিত ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে,—সেই সঙ্গে তালিকার কলেবরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তালিকা রাখবার স্থানের সংকুলান হওয়াও শেষ পর্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে পড়বে। আজকালকার গ্রন্থাগারে এ-সমস্যার সমাধান করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই ভালোমন্দ দুটি দিক বিচার করে দেখলে বলতে হয়, অন্ততঃ গ্রন্থাগারের মুখের দিকে চেয়ে তালিকা সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন আছে।

স্কুলের গ্রন্থাগারে সংক্ষিপ্ত তালিকার কথা বিশেষ ওঠে না। কিন্তু কলেজের গ্রন্থাগারে বিশেষ করে যে সব কলেজে গবেষণার কাজ হয় সে সব কলেজের গ্রন্থাগারে পুস্তিকা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

তালিকা-প্রকরণ ঃ ব্যবহারিক দিক

এইবার আমরা তালিকা-প্রকরণের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসে পড়লাম।

পুস্তকাগারের কাজ হচ্ছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্গের মত সেবা করা পুস্তকের তালিকা পুস্তকাগারে রাখা হয় ছাত্রদের ব্যবহারের জন্যে। সুতরাং তালিকার প্রয়োজনের প্রথম কথা হচ্ছে—যেমন পাঠক, তেমনি তালিকা হওয়া চাই। অর্থাৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে পুস্তকের তালিকা তৈরী হওয়া চাই। তালিকার প্রয়োজনীয়তার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—যেমন পুস্তকাগার, তালিকাও তেমনি হওয়া চাই। অর্থাৎ পুস্তকাগারে সঞ্চিত জ্ঞানরাশির ব্যবহার পুস্তকের তালিকার সাহায্যে যাতে ভালোভাবে করা যেতে পারে, সে-কথা তালিকা প্রস্তুত করবার পূর্বে ভেবে দেখতে হবে।

ধরুন, আপনার গ্রন্থাগারে 'উই' সম্বন্ধে কতকগুলি বই আছে। বিষয়ের তালিকা তৈরী করবার সময় যদি আপনি বিষয়ের নাম হিসাবে 'উই' কথাটি ব্যবহার না করে 'বল্মীক' কথাটি ব্যবহার করেন, তা হলে শতকরা ৯৯ জন তা খুঁজে পাবে না। কারণ, 'বল্মীক' কথাটার সঙ্গে সকলের পরিচয় না থাকতে পারে। আপনার পাঠকরা বিদ্বান গোষ্ঠীর হলে, 'বল্মীক' কথাটি ব্যবহার করা চলে, কিন্তু স্কুলের ছাত্রদের জন্য 'উই' কথাটি ব্যবহার করাই ভাল।

বিষয়তালিকার তৃতীয় কথা হচ্ছে, বিষয়ের নাম হিসাবে এমন কথা ব্যবহার করতে হবে, যা বিষয়টিকে মাত্র বোঝাবে, তার বেশি বা কম কিছু বোঝাবে না। অর্থাৎ বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। তালিকা-প্রস্তুতকারকের পক্ষে এইরূপে সুনির্দিষ্ট কথা ব্যবহার করবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কোন একটি তৈরী-করা বিষয়-শীর্ষক ব্যবহার করা। এরূপ বিষয়-শীর্ষকের বই কিনতে পাওয়া যায়।

লিখনে উল্লেখের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

এইবার পুস্তকের কোন্ কোন্ অংশ বইয়ের লিখনে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, দেখুন ঃ

(১) **প্রচ্ছদপটে উল্লিখিত নাম ঃ** এই নামটি পুস্তকের বাঁধাই-করা মলাটের উপর মুদ্রিত থাকে। লিখনের পক্ষে এ-নামের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে যদি বইয়ের নামের পাতার নাম থেকে মলাটের নাম পৃথক হয়,

তা হলে সে বিষয় লক্ষ্য করা ভাল। কারণ, কোন কোন পাঠক কেবল মলাটের নাম মনে রাখতে পারে।

(২) **দপ্তরীর ছাপা নামঃ** এই নামটি বইয়ের 'পুটে' বা শিরদাঁড়ায় ছাপা থাকে। এই নামটি যদি নামের পাতার নাম থেকে পৃথক হয়, তা হলে মুশকিল হয় কারণ, তালিকা হবে নামের পাতার নাম অনুসারে। পাঠক সেই নামেই বই চাইবে। কিন্তু শিরদাঁড়ায় অন্য নাম থাকলে মঞ্চে বইখানিকে চেনা যাবে না এবং খুঁজে বার করা যাবে না।

(৩) **অর্ধনামঃ** এই নামটি নামের পাতার আগের পাতায় থাকে। এর কোন প্রয়োজন নেই।

(৪) **সিরিজের নামঃ** সিরিজের নাম লিখনে থাকার প্রয়োজন আছে কারণ ছাত্রেরা জানতে চাইতে পারে কোন্ কোন্ সিরিজের কি কি বই গ্রন্থাগারে আছে। তবে কোন কোন সিরিজের নাম লিখনে ব্যবহার না করলেও চলে।

(৫) **নামপত্র** বা **নামের পাতাঃ** বই আরম্ভ হবার আগের পাতায় সাধারণতঃ বইয়ের নাম, লেখকের নাম, সংস্করণ, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা এবং প্রকাশের স্থান ও তারিখ ছাপা থাকে। আজকাল অনেক বইয়ের নামের পাতার পিছনেও প্রকাশের তারিখ ও সংস্করণের উল্লেখ থাকে। নামের পাতার নামই বইয়ের আসল নাম। সুতরাং এই নাম লিখনের উপর ব্যবহার করা দরকার।

(৬) **প্রণেতা** বা **লেখকঃ** কোন পুস্তকের অস্তিত্বের যিনি মূল কারণ, অর্থাৎ যিনি পুস্তকের সৃষ্টির মূলে থাকেন, পুস্তকের সেই লেখককে গ্রন্থকার বা পুস্তক-প্রণেতা বলা হয়। প্রণেতা বা লেখকের নাম পাঠকের কাছে অতি প্রয়োজনীয়।

(৭) **সংস্করণঃ** বইয়ের সংস্করণ অতি প্রয়োজনীয়। একখানি বই একবারের অধিক ছাপা হলেই তাকে সংস্করণ বলা হয় না, তাকে বলা হয় 'পুনর্মুদ্রণ'। বইয়ের বিষয়বস্তুর কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বা সংক্ষেপ করা হলে, তবেই তাকে সংস্করণ বলা হয় এবং সেই সঙ্গে বইখানির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে।

(৮) **প্রকাশের স্থানঃ** নামের পাতার নীচের দিকে প্রকাশ-স্থানের উল্লেখ থাকে। কলেজের গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রকাশের স্থান প্রয়োজনীয়।

(৯) **প্রকাশকের নামঃ** নামের পাতার নীচের দিকে এবং অনেক সময় নামের পাতার পিছন দিকে প্রকাশকের নাম থাকে। প্রকাশকের নামের উপর

অনেক সময় বইয়ের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে। সেইজন্যে প্রকাশকের নামের প্রয়োজন আছে।

(১০) **প্রকাশের তারিখ :** সকলপ্রকার বইয়ের লিখনে প্রকাশের তারিখ একান্ত আবশ্যক। লিখনে তারিখ থাকা চাই। নামের পাতায়, নামের পাতার পিছনে, বইয়ের শেষে যদি তারিখ না থাকে তা হলে মুখবন্ধের তারিখ, তাও যদি না থাকে, তাহলে স্বত্বসংরক্ষণের তারিখ দিতে হয়। কোন উপায়েই তারিখ পাওয়া না গেলে, আন্দাজের উপর নির্ভর করেও একটা তারিখ দিতে হয়।

(১১) **পাতার শীর্ষক নাম** (চল্‌তি নাম) : বইয়ের নাম সাধারণতঃ প্রতি পাতার উপরে ব্যবহৃত হয়। বইয়ের নামপত্রের অভাবে এই নাম ব্যবহার করতে হয়।

(১২) **মুখবন্ধ :** বই আরম্ভ হবার আগে মুখবন্ধ বা ভূমিকা থাকে। মুখবন্ধে বইয়ের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তালিকা-প্রস্তুতকারকের পক্ষে বইয়ের বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করবার জন্যে মুখবন্ধের প্রয়োজন আছে।

(১৩) **সূচীপত্র :** সূচীপত্র তালিকা-প্রস্তুতকারকের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

(১৪) **পাতা, ছবি, খণ্ড :** স্কুলের ও কলেজের পুস্তকাগারের লিখনে পাতা, ছবি বা খণ্ডের উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে। এমন অনেক বই আছে, যার লিখনে ছবিরও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন ধরুন, ভ্রমণের বই, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের বা ফলিত বিজ্ঞানের বই, ভূগোল, দেশবিদেশের রীতিনীতি-সম্বন্ধীয় বই।

(১৫) **আকার :** বেশি বড় বা বেশি ছোট বই হলে বইয়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ

আমরা পূর্বে বারবার বলেছি যে, পুস্তকের তালিকা করা হয় পাঠকের জন্যে। সুতরাং তালিকা যাতে পাঠকের প্রয়োজনানুরূপ হয়, সে-দিকে সব সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তালিকা কেবল আমাদের বোধগম্য হলে চলবে না, পাঠকেরও বোধগম্য হওয়া চাই। সেইজন্যে যখনই তালিকা প্রস্তুত করা হবে, তখনই তালিকা প্রস্তুতকারককে মনে রাখতে হবে যে, সে নিজেই পাঠক; তা হলে আর পুস্তকের তালিকা-প্রস্তুতের ব্যাপারে ভুল হবে না।

আর একটা কথা এখানে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেবল বই জড়ো করে রাখলেই গ্রন্থাগার হয় না, বইয়ের ব্যবহার হওয়া চাই এবং পাঠকের দ্বারা উপযুক্তভাবে বইয়ের ব্যবহার করিয়ে নিতে গেলে, গ্রন্থাগারে কি আছে না আছে, তা পাঠককে জানাতে হবে। সেইজন্যে গ্রন্থাগার যত বেশি ছোট হবে, তালিকা তত বেশি সম্পূর্ণ করতে হবে। কারণ, পাঠককে কিছু না কিছু দিতে যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। "নেই" বললে পাঠক বিরক্ত হয়ে যাবে, সে আর গ্রন্থাগারে আসবে না। ধরুন, এমন একখানি বই আপনার গ্রন্থাগারে আছে, যাতে দশটি বিষয় সম্বন্ধে দশটি প্রবন্ধ আছে। সেই বইখানির তালিকা এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে পাঠক তালিকা থেকে দশটি প্রবন্ধের কথাই জানতে পারে। এরূপ তালিকা প্রস্তুত করাকে বলা হয় 'বিষয়বিশ্লেষণ', অর্থাৎ প্রত্যেক প্রবন্ধের একটি করে বিষয়-লিখন লেখা প্রয়োজন।

ধরুন, মোহিতলাল মজুমদারের 'বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন'। এই পুস্তকে বিদেশী লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধ সঞ্চয়ন করা আছে। এই বইখানির লিখন লিখতে গেলে বইখানির একখানি সাধারণ লিখন লিখতে হবে, উপরন্তু প্রত্যেক লেখকের নামে একটি করে লিখন লিখতে হবে। এইরূপ লিখনকে বলা হয় 'লেখক-বিশ্লেষণ'।

অনেক সময় কোন কোন বইয়ের 'নাম-বিশ্লেষণ'-এর প্রয়োজন হয়—বিশেষ করে যে-সব বইয়ের দুটি নাম থাকে এবং সেই দুটি নাম 'বা' অথবা 'কিংবা' দিয়ে সংযুক্ত করা থাকে।

আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ও পাঠক অনুসারে যে তালিকা প্রস্তুত করতে হয়, সে-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু একটি নিয়ম

সব সময় মেনে চলা প্রয়োজন এবং সেই নিয়ম-অনুযায়ী লিখন লেখা উচিত। যেমন ধরুন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে যদি শরৎচন্দ্রের কোন বইয়ের 'লেখক-লিখন' লেখা হয়ে থাকে, তা হলে শরৎচন্দ্রের যত বই আছে, সে সব বইয়ের 'লেখক-লিখনে'-ও ব্যবহার করতে হবে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। 'শরৎচন্দ্র' নামের পরিবর্তে 'শরচ্চন্দ্র' বা 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি' লিখলে চলবে না। অবশ্য ভ্রমক্রমে শরৎচন্দ্রকে 'শরচ্চন্দ্র' নামেও কেউ খুঁজতে পারে। তালিকার ভিতরে সে-ব্যবস্থাও করে রাখা প্রয়োজন। সে-ক্ষেত্রে 'শরৎচন্দ্র' থেকে 'শরচ্চন্দ্রে' একটি 'দেখুন লিখন' করে রাখা দরকার।

তালিকা প্রস্তুত করবার জন্যে ছাপা নিয়মাবলী কিনতে পাওয়া যায়। এই ছাপা লিখনের নাম 'A. L. A. Codes' বা 'A. A. Codes'। গ্রন্থাগারের কাজে সুবিধার জন্যে এই ছাপা বই একখানি হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই নিয়মই চরম নয়, নিয়ম সব সময় নির্ভর করবে গ্রন্থাগার ও পাঠকের প্রয়োজনের উপর। কারণ, সোজা কথায় বলতে গেলে, আপনার ব্যবসায় বইয়ের, আপনার কারবার পাঠক নিয়ে এবং প্রত্যেক বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে পাঠকের প্রয়োজনানুসারে। কোন বই সম্বন্ধে আপনার মতামতের কোন মূল্য নেই, পাঠকের মতামতই সব। পাঠক বই বেছে নেবে, আর আপনি কেবল ধরে দেবেন তার সামনে আপনার যা আছে।

'লিখন'-এর শ্রেণীবিভাগ

এইবার আমরা পুস্তকের কত প্রকারের লিখন হতে পারে এবং সেই সব লিখন কিরূপে লিখতে হয়, সে কথা আরম্ভ করতে পারি।

এক-একটি লিখনের নামকরণ করা হয় লিখনের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি অনুসারে :

(ক) লিখনের প্রথম বিষয় যদি হয় 'লেখক', তা হলে সে-লিখনের নাম হবে 'লেখক-লিখন', বা 'প্রধান লিখন'; কারণ, এই লিখন অনুসারে অন্য লিখন লিখতে হবে।

(খ) লিখনের প্রথম বিষয় যদি হয় বইয়ের নাম, তা হলে তার নাম হবে 'নাম-লিখন'। সব বইয়ের এই লিখন লেখবার প্রয়োজন হয় না। উপন্যাস, গল্প, কাব্য বা কবিতা-সংগ্রহ, নাটক—এই সব বইয়ের এবং অদ্ভুত ধরনের নামের বইয়ের (যেমন, 'ভারত পথিক') 'নাম-লিখন' লেখবার প্রয়োজন হয়।

(গ) লিখনের প্রথম বিষয়টি যদি হয় 'বিষয়', তা হলে সে-লিখনকে বলা হয় 'বিষয়-লিখন'। অন্য যে-কোন লিখন অপেক্ষা এই 'বিষয়-লিখন'টি কঠিন। কেন কঠিন, সে কথা আমরা পরে বলব।

(ঘ) যে-লিখনের প্রথম বিষয় কোন 'সিরিজ'-এর নাম, সে লিখনকে বলা হয় 'সিরিজ-লিখন'।

(ঙ) যে-লিখন দ্বারা কোন একটি বিষয় থেকে আর একটি বিষয়ে, লেখকের একটি নাম থেকে সেই লেখকের অন্য নামে, কিংবা অন্য লেখকের নামে, বইয়ের একটি নাম থেকে বইয়ের অন্য নামে পাঠককে 'দেখুন' কথাটির দ্বারা পরিচালিত করা হয়, তাকে বলা হয় 'দেখুন লিখন'। 'দেখুন লিখন' ছাড়া সময় সময় 'আরো দেখুন লিখন' লেখবারও প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন 'লিখন'-এর নিয়মাবলী

এক-একটি লিখন কিরূপে লিখতে হয়, এইবার আমরা তার বিশদ বর্ণনা দেব :

লেখক-লিখন

লেখকের নাম বহু প্রকারের হতে পারে :

(১) এক বা একাধিক পুস্তকের প্রণেতা হিসাবে কোন লেখকের ব্যক্তিগত নামের পরিচয় ছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক সম্পর্কে সেই লেখকের বিভিন্ন পরিচয় থাকতে পারে। যেমন, তিনি তাঁর মৌলিক পুস্তক ছাড়াও অন্য কোন পুস্তকের লেখক হতে পারেন, অনুবাদক হতে পারেন, সম্পাদক হতে পারেন, আবার সঙ্কলয়িতাও হতে পারেন।

(২) লেখক কোন ছদ্ম নামে বই লিখতে পারেন।

(৩) লেখক নাম না দিয়ে অর্থাৎ নাম গোপন রেখেও বই লিখতে পারেন।

(৪) একাধিক লেখক যুক্তভাবে একই বই লিখতে পারেন।

(৫) কোন লেখক মাসিক পত্রিকা, অভিধান, বর্ষপঞ্জী, ইত্যাদি সম্পাদন বা সংকলন করতে পারেন।

(৬) ধর্মপুস্তক, আরব্য-রজনী, গীতা ইত্যাদি বইয়ে লেখকের একটা নাম পাওয়া গেলেও কিন্তু তাঁরাই যে গ্রন্থের সত্যিকারের প্রণেতা এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৭) কোন সঙ্ঘ, সংস্থা বা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক পুস্তক-পুস্তিকাসমূহ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত নামের লিখন ঃ ব্যক্তিগত নামের লিখন সম্বন্ধে বলবার পূর্বে প্রধান লিখন লেখবার একটি সাধারণ নমুনা দিলে কাজের সুবিধা হবে। কারণ, প্রধান লিখন লেখবার সময় এই সাধারণ নিখনটিকে সামনে রাখলে লিখন লেখায় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

একখানি বইয়ের কোন্ কোন্ অংশ পাঠকের কাছে প্রয়োজনীয়, তা আমরা পূর্বে বলেছি। এখানে তা আর বলার প্রয়োজন নেই। তবে এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে, সাধারণ পাঠকের কাছে লেখকের নাম, বইয়ের নাম ও বইয়ের ছাপার তারিখ—এইগুলির প্রয়োজন বেশি। সুতরাং কোন লিখনে এই বিষয়গুলি দিতেই হবে এবং জনসাধারণের ছোটখাটো গ্রন্থাগারে এই বিষয়গুলি লিখনে দিলেই যথেষ্ট। তবে, বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা, বইয়ের আকারের মাপ ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। কিন্তু একখানি বইয়ের এ-সব পরিচয় দিলেন, অথচ অন্য বইয়ের দিলেন না, এমন করা উচিত নয়।

লিখনের সাধারণ নমুনা

ক খ

	লে	খকের নাম
		পুস্তকের নাম ; সংস্করণ,
	প্র	কাশের স্থান, প্রকাশকের নাম,
	তা	রিখ। কয় খণ্ডের বই
		পৃষ্ঠা, ছবি, (সিরিজের
	না	ম)
		টীকা
		পরের কার্ড দেখুন

ক' খ'

কার্ডের বর্ণনা

সাধারণ তালিকা লেখবার কার্ডের নমুনা উপরে দেওয়া হল। এই কার্ডের মাপ ৫" × ৩"।

কার্ডের 'ক' ও 'ক''-চিহ্নিত লাইনটি হচ্ছে লেখক সীমা, অর্থাৎ এই লাইন থেকে লেখকের নাম লেখা শুরু করতে হবে। লেখক যতক্ষণ না নিজের স্থান অধিকার করছে, ততক্ষণ লেখকের ঘরে কিছুই লেখা হবে না। অবশ্য যে-সব বইয়ের লেখক নেই, বা যে-সব বইয়ে লেখকের নামের উল্লেখ নেই, সে-সব বইয়ের কথা ভিন্ন।

উপরে প্রদর্শিত কার্ডের নমুনায় 'খ' ও 'খ''-চিহ্নিত স্থান বরাবর যে লাইনটি রয়েছে, তা হল 'নাম-সীমা', অর্থাৎ ঐস্থান থেকে বইয়ের নাম লেখা শুরু করতে হবে।

কার্ডের নীচের দিকে একটি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রটি হচ্ছে ট্রের ডাণ্ডার সঙ্গে কার্ডখানিকে আটকে রাখবার জন্যে। কার্ডে যা কিছু লেখা হোক, ঐ ছিদ্রের উপরে তা শেষ করতে হবে। সমস্ত লেখা একখানি কার্ডে না আঁটলে আর একখানি কার্ড ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু আগের কার্ডে "পরের কার্ড দেখুন" বলে রাখতে হবে। এই কয়েকটি কথা কার্ডের নীচের দিকে ডান পাশের কোণে লিখতে হয় ('লিখনের সাধারণ নমুনা' দেখুন)।

পরের কার্ড যখন লেখা শুরু করবেন এবং সে-লেখা যদি পূর্বানুবৃত্তি হয়, তা হলে 'লেখক-সীমা' থেকে, প্রথম লাইন ছেড়ে শুরু করতে হবে এবং প্রথম লাইনটির উপর লিখতে হবে '২', তৃতীয় কার্ডে '৩' ইত্যাদি।

কার্ডের প্রথম লাইনটি ও পাশের দুটি লাইন লাল কালিতে টানা থাকে।

কার্ড পাতলা অথচ শক্ত হওয়া চাই কারণ, কার্ড বেশি পুরু হলে ট্রে শীঘ্র ভরে যাবে, আবার কার্ড শক্ত না হলে তা শীঘ্র নষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ কার্ড বাজারে যথেষ্ট কিনতে পাওয়া যায়।

লেখক-লিখনের নিয়ম

লেখক-লিখন প্রথম লাইনের উপরে, লেখক-সীমারেখা থেকে শুরু করুন। দেশী নাম ব্যতীত অন্য যে-কোন নামের শেষের অংশটি গোড়ায় ব্যবহার করুন, এবং দুটি অংশের অধিক অংশে নাম সম্পূর্ণ হলে নামের শেষের অর্থাৎ উপাধির অংশটি পুরোপুরি লিখে বাকি অংশগুলির আদ্যক্ষর ব্যবহার করুন, যেমন—Cole, G. D. H.

দেশী নাম পুরাপুরি লিখুন। 'প্রমথনাথ বিশী'র পরিবর্তে 'প্রমথ না বি' লিখবেন না। এক লাইনে লেখকের নাম না ধরলে নামের অবশিষ্টাংশ পরের লাইনে নিয়ে আসুন, কিন্তু 'নাম-সীমা' থেকে শুরু করুন।

লেখকের নাম লেখা শেষ হলে বইয়ের নাম লেখা শুরু করুন নাম-সীমারেখা থেকে ½" ছেড়ে। এক লাইনে নাম না আঁটলে পরের লাইনে বইয়ের নামের অবশিষ্টাংশ নিয়ে যান এবং এখন ½" না ছেড়েই লিখে যান। বইয়ের নাম লেখা শেষ হলে, বইখানির একাধিক সংস্করণ হয়ে থাকলে, যত সংস্করণ হয়েছে, তা লিখুন: ২য় সং, ৩য় সং ইত্যাদি। সংস্করণের পর ½" জায়গা ছেড়ে লিখুন—প্রকাশের স্থান, তারপর ½" জায়গা ছেড়ে প্রকাশকের নাম এবং শেষে পূর্ণচ্ছেদের পর বইখানি যত খণ্ডে সম্পূর্ণ, তা লিখুন: ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড ইত্যাদি। বইখানি কয় খণ্ডে প্রকাশিত, তা জানা না থাকলে শুধু লিখুন—খণ্ড। কোন একখানি বিশেষ খণ্ডের তালিকা করতে হলে কোন্ খণ্ডের তালিকা লিখলেন, তা সব লেখার পর একটি লাইন ছেড়ে বাঁ-ধারের দুইটি লম্বের মাঝখানে লিখুন।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। লিখনের মধ্যে যে 'ছেদ'গুলি (punctuations) দেওয়া হয়েছে, তার নিয়ম হচ্ছে ব্যাকরণের নিয়মের মতই। তবে এই ছেদগুলি নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে লিখনের মধ্যে পাঠকের জানবার মত বিষয়গুলি দেওয়া হল কিনা, সে সম্পর্কে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন।

বিষয়-লিখন

'বিষয়-লিখন' সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পূর্বে বলেছি। 'বিষয়-লিখন' লেখা মোটেই কঠিন নয়। কারণ, 'বিষয়-লিখন' লেখক-লিখনেরই মত, কেবল লেখক-লিখনটি এক লাইন নামিয়ে নিয়ে প্রথম লাইনে নাম-সীমা থেকে লাল কালিতে বা বড় অক্ষরে বিষয়ের নামটি লিখতে হয়।

বিষয়-লিখনের সব চেয়ে কঠিন অংশ হচ্ছে বিষয়ের নামটি ঠিকমত নির্ধারণ করা। তবে একটা সুখের বিষয় এই যে, এ-বিষয় নিয়ে অনেকে মাথা ঘামিয়েছেন এবং 'বিষয়-শীর্ষক' নামে বইও পাওয়া যায়। এইরূপ একখানি বই হাতের কাছে রাখলেই কাজ সহজ হয়। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, বিষয়-নির্ধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকের উপর নির্ভর করবে। সেই জন্যে নিজেরও একটি বিষয়-তালিকা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম মনে রাখবেন:

(১) বিষয়ের নাম এমন হওয়া চাই যা ছাত্রেরা বুঝতে পারবে;

(২) একটি মাত্র নামের দ্বারা পুস্তকের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৩) নাম বহুবচন হলে ভাল হয়।

(৪) একই বিষয়ের যত বই আছে, সে-সব বইই একই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত করতে হবে।

(৫) বিষয়ের এমন একটি নাম ব্যবহার করুন, যে-নামে সকলে বইখানির খোঁজ করবে।

(৬) কোন বিষয় কোন দেশানুযায়ী লেখা হয়ে থাকলে দেশের নাম আগে দিয়ে পরে বিষয়ের নাম দিন : বাংলা—নদনদী ; ভারত—ভূতত্ত্ব ইত্যাদি।

(৭) এক ধরনের নাম একসঙ্গে লিখুন : ভ্রমণ ও বর্ণনা ; Socialism & Communism ইত্যাদি। এ-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নাম থেকে একটি 'দেখুন লিখন' লিখতে হবে :

বর্ণনা দেখুন
ভ্রমণ ও বর্ণনা

বিষয়ের 'দেখুন লিখন' ও 'আরো দেখুন লিখন'

(১) **'দেখুন লিখন'** : 'দেখুন লিখনে' একটি নাম থেকে (ক) **সমসংজ্ঞাবাচক** বা (খ) **বিপরীত সংজ্ঞাবাচক** নামগুলি উল্লেখ করতে হয় :

(ক) **Moral philosophy see**
Ethics

(খ) **অমিতাচারিতা দেখুন**
পরিমিতাচারিতা

(২) **'আরো দেখুন লিখন'** : 'আরো দেখুন লিখন' লিখতে হয় একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পাঠককে পরিচালিত করবার জন্যে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রের একটি লিখন থাকা চাই আপনার তালিকায়। যেমন :

মিতাচারিতা আরো দেখুন
মদ্য
মাদক দ্রব্য
তামাক
গাঁজা
ইত্যাদি

'লেখক-লিখন' ও 'নাম লিখন'-এর ক্ষেত্রেও এরূপ 'দেখুন লিখন' ও 'আরো দেখুন লিখন'--এর প্রয়োজন হয়। যেমন ধরুন, রাষ্ট্রের কোন একটি বিভাগের বড়কর্তার নামের সঙ্গেই অনেক সময় সেই বিভাগটি বিশেষভাবে জড়িত থাকে। সেই কারণে সেই বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত সমস্ত বই সর্বদা বিভাগীয় কর্তার নামে প্রকাশিত হয়। সেই জন্যে বিভাগের নাম থেকে বিভাগের কর্তার নামে একটি 'আরো দেখুন লিখন' করা প্রয়োজন। এরূপ আরো অনেক ক্ষেত্র পাবেন, যেখানে 'দেখুন লিখন' ও 'আরো দেখুন লিখন'-এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সব সময়ে এই দুইটি লিখন লেখবার নিয়ম মনে রাখবার চেষ্টা করবেন।

নাম-লিখন

'নাম-লিখন' সম্বন্ধে আমরা বলেছি যে, কেবল উপন্যাস, কবিতার বই, নাটক ও অদ্ভুত ধরনের নামযুক্ত বইয়ের 'নাম-লিখন' লিখতে হয়।

'নাম-লিখন' কিছু নতুন নয়, 'লেখক-লিখন'কে উল্টে নিলেই 'নাম-লিখন' হল।

অনেক সময় বইয়ের নাম দীর্ঘ হয়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে নামটি সংক্ষিপ্ত করে নিতে হয় এবং সংক্ষেপিত অংশের স্থান এইরূপ (···) তিনটি বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়।

লিখন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আমরা সব কথাই বললাম। তবে লেখক নানা ধরনের হ'তে পারে যেমন যুক্ত-লেখক, আক্ষরিক লেখক (প্র, না, বি), সংজ্ঞের দ্বারা প্রকাশিত বই, কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত বই, লেখকের নামহীন বই, ধর্মপুস্তক ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে লেখক-লিখন লেখার নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম নেই কেবল লেখকের নামটা ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। সমুদয় নিয়ম এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যে A.L.A. বা A. A. Codes ব্যবহার করতে হবে।

কয়েকটি লিখনের নমুনা

লেখক

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; ৩য় সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সং। কলিকাতা, এ মুখার্জি, ১৯৫৮।

xiv, ৭৮৪ পৃ। ২২·৫ সেমি।

নাম

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; ৩য় সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সং। ১৯৫৮।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

সম্পাদক

অমিয়কুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক।

বিদেশী গল্পগুচ্ছ। কলিকাতা, অভ্যুদয়, ১৯৫৭।

২৩৬ পৃ। ২২ সেমি।

ছোটদের জন্য।

অনুবাদক

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুবাদক। তরু দত্ত।

কুমারী আরভ্যারের দিনপঞ্জী। কলিকাতা, কমলা। [তারিখ নাই]।

বিষয়

গ্রন্থবিদ্যা

আদিত্যকুমার ওহ্‌দেদার।

গ্রন্থবিদ্যা ঃ কাগজ ও মুদ্রণ। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৫৮।

ii, ৫৩ পৃ। ২৩·৫ সেমি।

অনুবাদ

হুইটম্যান, ওয়াল্ট।

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্র দ্বারা ইংরাজী হইতে অনূদিত। কলিকাতা, দীপায়ন প্রকাশক, ১৯৫৮।

viii, ৯৩ পৃ। ২২ সেমি।

ছদ্মনাম

দেবেশ রায়।

পথে প্রান্তরে, বেদুইন 'ছদ্মনাম' দ্বারা লিখিত। কলিকাতা, বিদ্যোদয়, ১৯৫৮।

ii, ১৮৩ পৃ। ২২ সেমি।

দেখুন

বেদুইন 'ছদ্মনাম'

দেখুন

দেবেশ রায়।

সংস্থা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৬২।

xiv, ২৩২ পৃ।

সরকার

পশ্চিমবঙ্গ। কৃষি অধিকার।

নারকেলের চাষ। কলিকাতা, প্রচার বিভাগ, [তারিখ নাই]।

৬৪ পৃ। চিত্র। ১২ × ১৮ সেমি।

পত্রিকা

গ্রন্থাগার। খণ্ড ১- ; ১৩৫৭- ।

কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৫৭- ।

মাসিক।

চঞ্চলকুমার সেন, সম্পাদক।

ধর্মপুস্তক

রামায়ণ

বাল্মীকি রামায়ণ, শিশিরকুমার নিয়োগী দ্বারা সংক্ষেপিত ও অনূদিত। কলিকাতা, এ মুখার্জি, ১৯৫৮।

xxxvi, ১০০০ পৃ। ১৮·৫ সেমি।

যুগ্মলেখক

Ruschmann, Karl-Heinz, and Mukhopadhyay, Rajkumar.

German for Indians, 2nd rev. ed. Calcutta, World press, 1964.

xxxi, 256 p. 20·5 cm

বই দেওয়া-নেওয়া

বই দেওয়া-নেওয়ার স্থান : বিশেষ করে স্কুলের গ্রন্থাগারে এই স্থানটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে বা কলেজের গ্রন্থাগারে কোন্ বিষয়ের কত বই বার হচ্ছে তার হিসাবের উপরই জোর দেওয়া হয় কিন্তু স্কুলের গ্রন্থাগারে গ্রাহকের উপর নজর রাখার প্রয়োজন বেশি কারণ কোন্ ছাত্র কোন্ বিষয় পড়তে ভালোবাসে, কোন্ ছাত্র প্রতি মাসে গ্রন্থাগার কতটা ব্যবহার করছে, কি ধরনের বই পেলে কোন্ ছাত্র বেশি পড়বে এ সব বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে না পারলে ছাত্রদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস জাগিয়ে তুলতে পারা যায় না এবং প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে গ্রন্থাগার ঠিক মত ব্যবহার করবার জন্য পরিচালিত করতে পারা যায় না।

সুতরাং এই স্থানটির উপর যে কর্মীর ভার দেওয়া থাকবে তার সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগার বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের স্কুলের গ্রন্থাগারে একাই গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের সমুদয় কাজ করতে হয়, কিন্তু তা সম্ভব নয়, সে কথা আমরা বলেছি। এখানে গ্রন্থাগারিক নিজেই কাজ করুন বা কোন কর্মীর উপর এই স্থানের ভার থাক, তাকে তার কাজ সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকতে হবে। যে কোন গ্রন্থাগারে এই স্থানটি হল একমাত্র স্থান যেখানে গ্রন্থাগারের কর্মীর সঙ্গে পাঠকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে। এস্থানে কাজ করতে গেলে ছাত্রদের সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করতে জানা দরকার। এখানে কাজ করতে হলে অসীম ধৈর্য থাকা চাই। নানা বয়েসের ছাত্ররা এখানে আসবে তাদের পাঠের চাহিদা মেটাতে। অনেক প্রশ্ন তাদের কাছ থেকে উঠবে ; অনেকে হয়ত নিজের প্রয়োজনটাই প্রকাশ করে বলতে পারবে না—এরূপ বহুক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের বা কর্মীর ধৈর্য হারালে চলবে না।

এই স্থানেই থাকে পাঠকদের চাহিদার মাপকাঠি। এই মাপকাঠি অর্থাৎ পুস্তক নির্গমনের হিসাব থেকেই বুঝতে পারা যাবে পাঠকেরা কি ধরনের বই বেশি পড়তে চায়, কোন্ বিষয়ের বই গ্রন্থাগারে যথেষ্ট পরিমাণে নেই, কোন্ বিষয়ের বই প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হচ্ছে না। সুতরাং এই স্থানটির ভার যে কর্মীর উপর থাকবে গ্রন্থাগারিকের কাছে সেই কর্মীই সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় কারণ তারই সাহায্যে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল করতে পারবে।

বই দেওয়া-নেওয়া : বই দেওয়া-নেওয়ার কাজের তৎপরতার উপর নির্ভর

করে নানাবিধ পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে বা যে গ্রন্থাগারে পাঠকসংখ্যা বহু সে গ্রন্থাগারে বই দেওয়া-নেওয়ার কাজটা যাতে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশেষ করে স্কুলের গ্রন্থাগারে সে সমস্যা থাকে না। আমরা আগেই বলেছি যে কোন্ বিষয়ের বই কত বার হচ্ছে সাধারণতঃ তার উপরেই লক্ষ্য রেখে বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রাখা হয়। কিন্তু স্কুলের ক্ষেত্রে, কোন্ ছাত্র কি বই পড়ছে এবং কোন্ ছাত্র গ্রন্থাগার কি ভাবে ব্যবহার করছে স্কুলের গ্রন্থাগারে তার হিসাব রাখার প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন বই দেওয়া-নেওয়ার উপায় থেকে, প্রয়োজন হলে তিনটি বিষয় জানতে পারা চাই :—

১। কার কাছে বই আছে।

২। কোন্ বই কার কাছে আছে।

৩। কোন্ বই কখন কে ফেরত দেবে।

বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব দুই ভাবে রাখা যেতে পারে। খাতায়, না হয় ট্রে ও কার্ডের সাহায্যে। খাতায় হিসাব রাখবার পন্থায়—তা সে পন্থা যে ধরনেরই হক না কেন—সময় বেশি লাগবে। তবে সুবিধা হচ্ছে কে কোন্ বিষয়ের কত বই পড়ছে তার একটা হিসাব থেকে যাবে। খাতায় হিসাব রাখতে গেলে এই ভাবে একখানি খাতা করতে হবে :—

শ্রেণী

নির্গমনের তারিখ	পাঠকের নাম	লেখক ও বইয়ের নাম	ফেরত দিবার তারিখ	জাতি সংখ্যা

কোন পাঠককে একখানি বই দেবার সময় গ্রন্থাগারের কর্মীকে নিজে সব ঘরগুলি পূর্ণ করতে হবে এবং বই ফেরত এলে ফেরত দিবার তারিখে একটি ✓ চিহ্ন দিলেই কাজ মিটে যাবে। কিন্তু এ পন্থায় বই দেবার সময় যথেষ্ট সময় লাগবে এবং বই ফেরত নেবার সময়ও সময় বড় কম লাগবে না কারণ এক তারিখে বহু বই দেওয়া হয়ে থাকতে পারে ফলে একটি নামকে খুঁজে বার করতে হবে। তার উপর উপরিউক্ত প্রশ্ন কয়টির উত্তর দেওয়া খুব সোজা হবে না।

শ্রেণী হিসাবে খাতাটিকে ভাগ করে নেওয়া যায়। খাতার গোড়ার দিকে শ্রেণী হিসাবে পত্র নির্দেশক সূচী রাখা চলে, না হয় Thumb index ব্যবহার করা চলে। এভাবে হিসাব রাখলে স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয় এবং কোন্ ছাত্র গ্রন্থাগার কিরূপ ব্যবহার করছে তা বোঝা কতকটা সুবিধা হয় বটে কিন্তু অন্য প্রশ্নগুলির সন্ধান দিতে সময় আরও বেড়ে যায়।

আমাদের মনে হয় কার্ড ও ট্রে ব্যবহার করলে সব দিক থেকেই সুবিধা হয় যদি প্রতিদিনের বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব করে রাখা হয়।

নিম্নলিখিত ভাবে একখানি কার্ড ছাপিয়ে রাখলে বই দেওয়া-নেওয়ার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হতে পারে :

পাঠকের নাম শ্রেণী	লেখক বইয়ের নাম	নিঃ তাঃ	ফেঃ তাঃ	জাতি সংখ্যা

কোন ছাত্র বই নিতে এলে তাকে এই কার্ড একখানি দেওয়া হবে। তার নাম ও শ্রেণী এবং প্রতিবারই যখন সে বই নেবে লেখকের নাম, বইয়ের নাম, কোন্ তারিখে বই নিচ্ছে এবং পুস্তকের জাতি সংখ্যা লিখে দেবে। বই খানি তাকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং কর্মী নিজে কার্ডের উপর ও বইয়ের তারিখ পত্রে বই ফেরত দিবার তারিখ রাবার ষ্ট্যাম্প-এর দ্বারা ছেপে দেবে। কার্ডগুলি পাঠকের নামের আদ্যক্ষর বা পুস্তকের জাতি সংখ্যা অনুযায়ী সাজান থাকবে। এভাবে প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত হিসাব রাখা সম্ভব হবে। কার্ডখানি পূর্ণ হয়ে গেলে পরিবর্তে একখানি নতুন কার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং পুরনো কার্ডখানি আলাদা করে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলেজে Book card in tray কিংবা Book card in book পন্থা ব্যবহার করতে পারা যায়।

একখানি কার্ডে বই দেওয়া-নেওয়া

প্রত্যেক ছাত্রের নামে একখানি কার্ড করে কি ভাবে বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ হতে পারে তা আমরা বলেছি। প্রত্যেক বইয়ের একখানি পরিচয় পত্র করেও বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ করা যেতে পারে।

কার্ডখানি বইয়ের মলাটের পকেটের ভিতর পিছন দিকে থাকবে। পাঠক যে বই চায় সে বইখানি পাওয়া গেলে কার্ডখানির বাম দিকের পাতায় যে তারিখ পত্র থাকবে সেই তারিখ পত্রে বই ফেরত দিবার তারিখ দিয়ে, কার্ডে পাঠকের নাম ও শ্রেণী লিখে নিয়ে এবং ফেরত দিবার তারিখ দিয়ে বইখানি পাঠককে দিয়ে দেওয়া হল এবং কার্ডখানি তারিখ অনুযায়ী, না হয় প্রথমে শ্রেণী ও পরে তারিখ অনুযায়ী একটি ট্রেতে সাজিয়ে রাখা হল। বইখানি ফেরত এলে বইখানির কার্ড বার করে নিয়ে বইয়ের পকেটে রেখে বইখানি মঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ শেষ হল। এভাবে বই দেওয়া-নেওয়ায় কিছুটা সময় লাগে কিন্তু বই দেওয়া-নেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়। কারণ বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাবে পাঠকের এবং পুস্তকের পরিচয় এক সঙ্গে থেকে যায়।

কার্ডখানিকে বইয়ের পকেটের ভিতর না রেখে বই দেওয়া-নেওয়ার স্থানে একটি ট্রেতে রেখে দেওয়া যায়। বইখানি এলে ট্রেতে রাখা কার্ডখানি বার করে নিয়ে তাতে লেখকের পরিচয় লিখে, বইয়ের তারিখ পত্রে ও কার্ডে তারিখ দিয়ে বইখানি পাঠককে দিয়ে দেওয়া হল এবং কার্ডখানি পুস্তক নির্গমনের ট্রেতে সাজিয়ে রাখা হল। বই ফেরত এলে কার্ড খানিকে ট্রে থেকে বার করে নিয়ে যথা স্থানে রাখলেই কাজ মিটে গেল।

এ ছাড়া আরও বহু উপায়ে বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ হতে পারে। কিন্তু আর যে পন্থা আছে সেগুলিতে কেবল সময়েরই সংক্ষেপ করা হয় এবং তা ব্যবহার হয় যে সব গ্রন্থাগারের গ্রাহক খুব বেশি সেখানে। স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারে শেষোক্ত দুটি পন্থার কোন একটি চালু করলে ভালো কাজ হয়।

এই দুটি পন্থার প্রয়োজন হবে :—

১। একটি বা দুটি প্রয়োজন মত মাপের ট্রে—১৮" লম্বা হলে ভালো হয়।

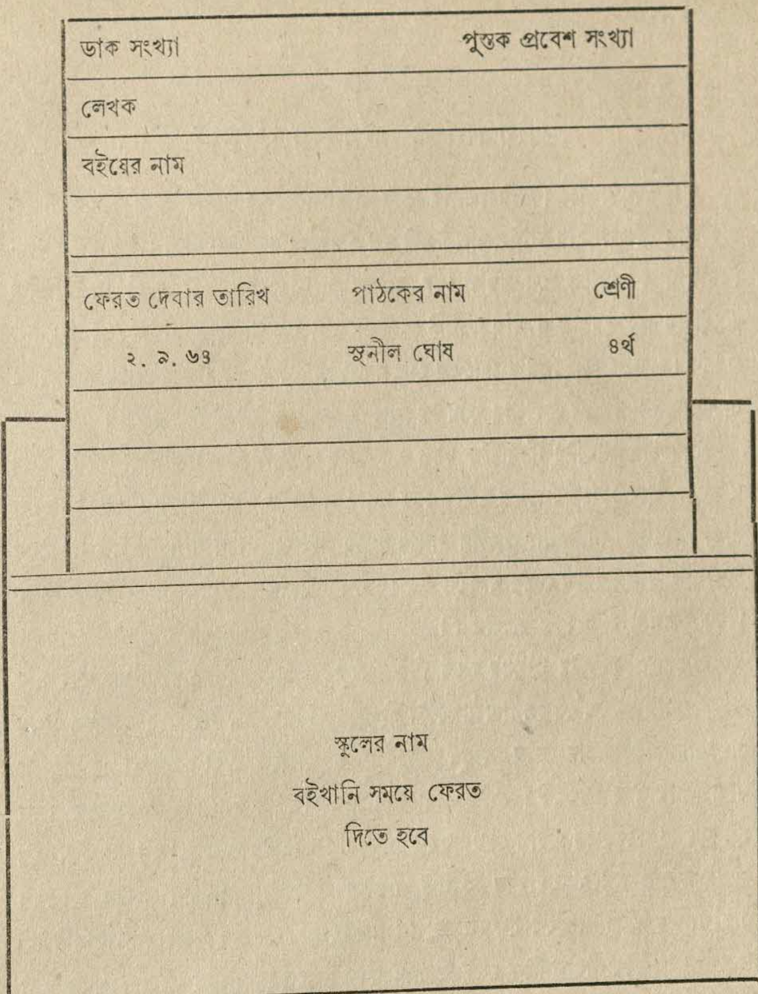
২। পুস্তকের পরিচয় পত্র ৫" × ৩"।

৩। তারিখ নির্দেশক পত্র। প্রতিদিনের নির্গত বইয়ে পরিচয় পত্র এই তারিখ নির্দেশকের পিছনে থাকবে।

৪। কার্ডের ঠেকনা। ট্রের ভিতর কার্ডগুলিকে সোজা করে রাখবার জন্যে এই ঠেকনার প্রয়োজন।

৫। বইয়ের পিছনের মলাটের ভিতর দিকে একটি পকেট।

এ ভাবে বইয়ের নির্গমনের হিসাব রাখলে যে বইখানি সময়ে ফেরত আসবে না সে বইয়ের কার্ডখানি আপনা থেকেই সমুখে এসে যাবে। বই দেওয়ার কাজ



বইয়ের পকেটে কার্ড (পাঠকের পরিচয়পত্র বিহীন বই দেওয়া-নেওয়ার উপায়)

শেষ হলে যে বইগুলি নির্গত হল সেই বইয়ের কার্ডগুলি ডাক সংখ্যা অনুযায়ী ট্রের পিছন দিকে রেখে দিন। ট্রের পিছন দিকে নতুন তারিখের ও সামনের দিকে ক্রমশঃ পুরনো তারিখের কার্ডগুলি থাকবে। ফলে যে দিন যে বই ফেরত দেবার কথা সে দিন সে বই ট্রের সমুখে এসে যাবে।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কমিটি

স্কুলের গ্রন্থাগারের পরিচালনার ভার গ্রন্থাগারিকের উপর ন্যস্ত থাকে কিন্তু গ্রন্থাগার পরিচালনার আইনগুলি তৈরী হয় গ্রন্থাগার কমিটির দ্বারা। এদিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে গ্রন্থাগারের স্বচারু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার কমিটির প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগার কমিটি আইন তৈরী করবে, গ্রন্থাগারিক তা প্রয়োগ করবে। ফলে আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের স্বাধীনতা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে, প্রতি পদে গ্রন্থাগার কমিটির হাত দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

গ্রন্থাগার কমিটির গঠন ঠিক হলে এবং তার ক্ষমতার ঠিক মত সীমা নির্দেশ করা থাকলে স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া সম্ভব। তা না হলে গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগে না। তাকে সব সময় গ্রন্থাগার কমিটির মুখ চেয়ে থাকতে হয়। সে কারণে গ্রন্থাগার কমিটির গঠনের দিকে নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার কমিটির গঠনের পূর্বে ঠিক করে নিতে হবে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উপদেষ্টা হিসাবে থাকবে, না, গ্রন্থাগার কমিটির উপর গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ ভাবে ন্যস্ত থাকবে এবং গ্রন্থাগারিক কেবল মাত্র গ্রন্থাগার কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে। আমাদের মনে হয় স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কমিটির ক্ষমতা যত সংকীর্ণ হয় ততই ভালো অর্থাৎ গ্রন্থাগার কমিটি কেবল উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে। গ্রন্থাগারিক দায়ী থাকবে কেবল প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রয়োজনানুযায়ী যা ভালো মনে হবে গ্রন্থাগারিক সেই ভাবেই কাজ করবে। কোন কাজ করবার জন্য তাকে গ্রন্থাগার কমিটির ভোটের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে না। কলেজে গ্রন্থাগারিক তার কাজের জন্যে দায়ী থাকবে Principal-এর কাছে। স্কুলের বা কলেজের গ্রন্থাগারকে প্রয়োজনীয় করতে গেলে গ্রন্থাগারিককে স্বাধীনতা দিতেই হবে।

কিন্তু কমিটির প্রয়োজন আছে। প্রথমত গ্রন্থাগারের সংগঠনের দিকে কমিটি নানা ভাবে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত গ্রন্থাগার কমিটি স্কুল বা কলেজ ও গ্রন্থাগারের মাঝখানে থেকে একটি সংযোগস্থল হিসাবে একটির সহিত আর

একটিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোজিত করতে পারে। এক্ষেত্রে কমিটি হল জনমত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জনমত হিসাবে কাজ করতে পারে। এদিক থেকে গ্রন্থাগার কমিটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার কেমন চলছে, কাজ কতটা হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারা যায় জনমত থেকে।

কেবলমাত্র স্কুলের কর্মীদের মধ্যে থেকে যদি কমিটিতে সদস্য নেওয়া যায় তা হলে সারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত সম্পূর্ণ ভাবে কমিটির দ্বারা প্রতিফলিত হবে না কারণ ছাত্রেরা বাদ পড়ে যাবে। সুতরাং কর্মী এবং ছাত্রদের মধ্যে থেকে এই কমিটির সদস্য নির্বাচন করতে হবে। অবশ্য ছাত্রদের মধ্যে থেকে আসবে উঁচু শ্রেণীর ছাত্র।

সদস্যসংখ্যা খুব বেশি না হওয়াই ভালো কারণ সভা আয়ত্তের মধ্যে রাখা সম্ভব না হতে পারে। গ্রন্থাগারিক সভার সভাপতি হিসাবে থাকবে। সভার সভ্যদের মধ্যে অর্ধেক কর্মী ও অর্ধেক ছাত্র হলে ভাল হয়।

গ্রন্থাগার কমিটির যে সভা হবে তা নিয়মিত ভাবে নির্ধারিত দিনে হওয়া চাই। প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর সভার দিনগুলি আগে থাকতেই ঠিক করে রাখা প্রয়োজন। সভার কাজ হবে কিভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা সুচারুরূপে হয় এবং কিভাবে গ্রন্থাগারের কাজের উন্নতি করা যায় তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা। কি কি বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হবে তা গ্রন্থাগারিক সভা বসবার পূর্বেই ছাপিয়ে প্রত্যেক সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। বিষয়গুলি তৈরী করবার পূর্বে গ্রন্থাগারিক সদস্যদের কাছ থেকে এবং ছাত্রদের কাছ থেকে তাদের যদি কোন প্রস্তাব থাকে তা চেয়ে পাঠাবে। প্রস্তাবের একটি দফায় থাকবে "অন্যান্য"—অর্থাৎ ছোটখাটো সামান্য ব্যাপার।

গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরিক কার্য সম্বন্ধে আইন, গ্রন্থাগার খোলা ও বন্ধ হবার সময়, বই ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে আইনের প্রয়োগ, গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ ও পুস্তক নির্বাচন, এই সব বিষয়গুলি গ্রন্থাগার কমিটির কাছে প্রস্তাব হিসাবে পেশ করা প্রয়োজন। পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিটির মতামত একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগত ভাবে গ্রন্থাগার কমিটির প্রত্যেক সভ্য কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ফলে তাদের মতামত পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় সত্য কিন্তু পুস্তকের প্রয়োজনটা যেন ব্যক্তিগত না হয়ে পড়ে, তা হলেই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলনের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব এসে যাবে। কেবল তাই নয়, নিজস্ব স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে বা কোন পুস্তক বিক্রেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা গ্রন্থাগারিককে অনেক সময় অকেজো বই কিনতে বাধ্য করাতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে

নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে তার মতামত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং নিজের ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগারের প্রত্যেক কর্মীর সাহায্য নেওয়া উচিত। প্রত্যেক কর্মীর উপর তার বিশ্বাস থাকা চাই এবং কর্মীদেরও নিজেদের উন্নতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের উপর আস্থা থাকা চাই। প্রত্যেক কর্মীর কাজের উপযুক্ত প্রশংসা গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে পাবে কর্মীরা সে আশা করতে পারে।

ছাত্ররা যদি গ্রন্থাগারের নানা কাজে গ্রন্থাগারিককে সাহায্য করতে চায় তা হলে গ্রন্থাগারিকের আনন্দের সহিত তাদের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার। গ্রন্থাগারের আইন ভঙ্গ করার শাস্তি হিসাবে কোন ছাত্রকে জোর করে কোন কাজ করিয়ে নেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। তাতে ছাত্রদের বই এবং বই সম্বন্ধে সকল কাজের উপর একটা বিরক্তির ভাব এসে যাবে; তারা বইকে এবং বই সম্বন্ধীয় সমুদয় কাজকে শাস্তি হিসাবে ধরে নেবে।

গ্রন্থাগারে বহু কাজ আছে যা, যারা স্বইচ্ছায় কাজ করতে চায়, তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারা যায়। সেই কাজ যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররাই করতে পারবে তা নয়। ছোটখাটো এমন অনেক কাজ আছে যা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারাও করিয়ে নেওয়া যায়। এই সব কর্মীদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেবার সময় তাদের কাজের দায়িত্বটা ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তাদের কাজের মধ্যে যেন আনন্দ থাকে এবং তাদের কাজের প্রয়োজন যে গ্রন্থাগারে আছে তা যেন তারা বুঝতে পারে।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় অর্থ ধার্য করা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি সুতরাং সে বিষয় এখানে আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তবে মনে রাখতে হবে এই কয়টি খাতে প্রত্যেক বছরেই টাকা ধার্য করতে হবে :—

১। বইয়ের জন্য অর্থ।

২। বই বাঁধাইয়ের জন্য অর্থ। এই অর্থের পরিমাণ প্রতি বছরেই বাড়তে থাকবে।

৩। সাময়িক পত্রের জন্য অর্থ।

৪। পরিচালনার খরচ।

এই কয়টি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে প্রথম ও তৃতীয়। সমুদয় ধার্য টাকার প্রায় ৭৫ ভাগ এই দুটি খাতে প্রয়োজন হবে। গ্রন্থাগার গড়ে-তোলার প্রথমদিকে ভিত্তিক সংকলন গড়ে তোলবার জন্যে আরো বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে।

গ্রন্থাগার ব্যবহার

গ্রন্থাগার ব্যবহারের দুটি দিক আছে ঃ

১। স্কুল থেকেই ছাত্ররা যদি ঠিক ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে শেখে তা হলে তাদের শিক্ষায় গ্রন্থাগার থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ততটা সাহায্য তারা নিতে পারে এবং পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা যথাযথভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে।

২। গ্রন্থাগার ঠিক মত ব্যবহৃত হলে গ্রন্থাগারের এবং স্কুলের উদ্দেশ্য সফল করা সোজা হয়। এই দুইটি কারণে স্কুলে এবং কলেজে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়ার যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের যা শিক্ষা দেওয়া হবে তা হবে প্রাথমিক কিন্তু সে জন্যে সময়ের প্রয়োজন হবে বেশি কারণ তাদের একই বিষয় বার বার বলতে হবে এবং একই বিষয় বার বার দেখাতে হবে। যারা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র তাদের শিক্ষা দিতে সময় বেশি লাগবে না কারণ তারা এরই মধ্যে গ্রন্থাগারের টেকনিক কতকটা শিখে নিয়েছে এবং তাদের মনের কতকটা পরিণতি হওয়ার দরুন তাদের একই জিনিস বারবার বলবার প্রয়োজন হবে না। গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সময়টা ছাত্রদের এবং শিক্ষালয়ের সুবিধামত ঠিক করতে হবে। গ্রন্থাগারের কাজ কি ভাবে হয়, কি ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয় ছাত্রদের গ্রন্থাগারে নিয়ে এসে, তা শিক্ষা দেবার সময় ঠিক করতে হবে।

কি কি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে ?

১। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য কি ? সমস্ত স্কুল এবং কলেজের উন্নতি করাই গ্রন্থাগারের কাজ। যারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করছে তাদের কর্তব্য হচ্ছে গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের উন্নতির কাজে সাহায্য করা। কারণ তাদেরও গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন করার দায়িত্ব আছে।

২। গ্রন্থাগার ব্যবহার করবার জন্য যে সময় নির্ধারিত করা আছে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারের যে সমুদয় আইন আছে তা পুরাপুরি কাজে লাগান দরকার। বই সময়ে ফেরত দেওয়া এবং বই যত্নের সহিত ব্যবহার করা দরকার।

৩। কি ভাবে গ্রন্থাগার থেকে বই নিতে হয় ? বই দেওয়া নেওয়ার পন্থা যা

গ্রন্থাগারে প্রচলিত তা এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পন্থা ছাত্রদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৪। পুস্তক-মঞ্চে বই কি ভাবে সাজান হয়? এক্ষেত্রে পুস্তকের জাতি-বিচারের জটিলতা ছাত্রদের কাছে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। অতি সাধারণ ভাবে জাতি-বিচারের পন্থা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। Broken order, সমান্তরাল জাতি-বিচার কি? শেল্‌ফ থেকে কি ভাবে বই টেনে বার করা হয়, এই সব বিষয় তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সাধারণ শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে উপরের বিষয় কটি। গ্রন্থাগারের কোথায় কি আছে তা ছাত্রদের জানা প্রয়োজন। সে জন্যে গ্রন্থাগারের কোথায় কি আছে তা দেখিয়ে দিতে হবে এবং সম্ভব হলে ছাত্রদের বলতে হবে গ্রন্থাগারের একটি নকশা আঁকতে। নকশায় কোথায় কি আছে তা নির্দেশ করতে হবে।

যে সময়ে ছাত্ররা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে শিক্ষার জন্য আসবে সেই সময়ের বেশ খানিকটা অংশ ছাত্রেরা যাতে পুস্তক-মঞ্চে নিজের ইচ্ছামত বই দেখে ঘুরে বেড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময়ে মঞ্চে তারা কি করছে না করছে তা দেখবার জন্য কোন কর্মী থাকবে না—এখানে ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। পুস্তক-মঞ্চে ঘুরতে ঘুরতে বই দেখতে দেখতে ক্রমশঃ তাদের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকবে। মঞ্চ থেকে বই বার করে তারা খুলে দেখবে। এইভাবে বইয়ের সান্নিধ্যে আসার দরুন তাদের কোন কোন বই পড়বার ইচ্ছা জাগতে পারে, নানা প্রশ্ন তাদের মনে উঠতে পারে।

মুখে মুখে শিক্ষা দেবার পর তাদের হাতে নাতে শিক্ষা দিতে হবে। সে জন্যে ছাত্রদের কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে এক একটি দলকে এক একটি কাজের ভার দিতে হবে।

এইগুলি গেল সাধারণ বিষয়। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ও তাদের শিক্ষা দিতে হবে।

আক্ষরিক বিন্যাস

আক্ষরিক ভাবে বইয়ের লিখন সাজান মনে হয় খুব সোজা। এবং বাস্তবিকই তা খুব কঠিন নয়। কিন্তু ছাত্রদের কাছে খুবই জটিল মনে হতে পারে কারণ বিদেশী ব্যক্তিগত নাম নানা ভাবে সাজান হয় দেশী নামের তো কথাই নেই। সুতরাং গ্রন্থাগারে বিভিন্ন দেশের নাম এবং বিভিন্ন ধরনের নাম, যেমন যুক্ত নাম,

যুগ্ম-লেখকের নাম, Mac, O' ইত্যাদি সম্বলিত নাম কি ভাবে সাজান হয়েছে তা ছাত্রদের দেখাতে হবে। প্রথমে বিষয়টিকে যত সোজাভাবে শেখান যায় ততই ভাল। জটিলতা যা কিছু আছে ক্রমশঃ ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

প্রথম তাদের শেখান হবে, সাজান দুইভাবে হতে পারে: আক্ষরিক ভাবে এবং কথায় কথায়। নানা ধরনের উদাহরণ দিয়ে তাদের এ বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। প্রথম তাদের শিক্ষা দিতে হবে প্রথম অক্ষরে সাজান অর্থাৎ ক খ গ ঘ বা A B C D হিসাবে, পরে একই বিষয়গুলিকে দ্বিতীয় অক্ষরে, ক্রমশঃ সম্পূর্ণ আক্ষরিক বিন্যাস তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে।

সাজানোর সাধারণ নিয়মগুলি যখন তাদের আয়ত্ত হয়ে যাবে তখন তাদের একে একে জটিলতাগুলি শেখাতে হবে। শেল্‌ফে উপন্যাস বা গল্পের বই যদি আক্ষরিক ভাবে সাজান থাকে তা হলে ছাত্রদের লেখকের নাম ও পুস্তকের নাম দিয়ে বই বার করে আনতে বলতে হবে। পুস্তকের জাতিসংখ্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের কতকটা ধারণা হলে তাদের দ্বারা মঞ্চ থেকে বই বার করে আনার কাজও করিয়ে নিতে হবে। এর পরের কাজ হবে ছাত্রদের পুস্তক-তালিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

পুস্তক-তালিকা

পুস্তক-তালিকা সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে:

১। গ্রন্থাগারে কি কি তালিকা আছে?

২। প্রত্যেক তালিকার উদ্দেশ্য কি?

৩। তালিকায় লিখনগুলি কি ভাবে সাজান আছে; লিখনে পুস্তকের কিভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়?

৪। তালিকা কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়?

৫। প্রত্যেক তালিকা কি কি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে?

তালিকা সম্বন্ধে সমুদয় কথা আমরা 'পুস্তক-তালিকা' অধ্যায়ে বলেছি। সুতরাং সে সব কথা আর এখানে নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

শিক্ষার কাজটা শুরু করতে হবে লেখক-তালিকা থেকে। তাদের জানাতে হবে এই তালিকা সকল গ্রন্থাগারেই থাকে। এই তালিকায় পুস্তকের সম্পূর্ণ বিবরণ থাকে। এই তালিকা সম্বন্ধে শেখাবার সময়, শীর্ষকগুলি কি নিয়মে লেখা হয় তা ছাত্রদের জানাতে হবে।

তালিকা সম্বন্ধে কিছুটা ছাত্রদের জানা হয়ে গেলে তাদের জাতিসংখ্যা অনুযায়ী বিন্যাসিত তালিকা এবং সেই সঙ্গে মঞ্চ-তালিকা সম্বন্ধে কিছুটা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। মঞ্চ-তালিকা কেন রাখা হয়, মঞ্চ তালিকা ও জাতিসংখ্যা অনুযায়ী সাজান তালিকার মধ্যে সম্বন্ধ কি, মঞ্চ তালিকায় পুস্তকাগমনের সংখ্যা কেন দেওয়া থাকে—এসব বিষয় ছাত্রদের জানাতে হবে।

বিষয়-তালিকা সাধারণত একটু জটিল হয়ে থাকে। এই তালিকার উদ্দেশ্য কি, কিভাবে শীর্ষকগুলি বেছে নেওয়া হয়, কোন একটি শীর্ষকে বই না পেলে আর কোন্ শীর্ষক দেখতে হয় ইত্যাদি ছাত্রদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হয়।

প্রথম ছাত্ররা শিখবে লেখকের নাম জানা থাকলে কোন্ তালিকার সাহায্যে বই বার করতে হয়। তারপর শিখবে বিষয় জানা থাকলে কিভাবে বই বার করতে হয় এবং পরে বইয়ের নাম জানা থাকলে কিভাবে অর্থাৎ কোন্ তালিকার সাহায্যে বই বার করতে হয় এবং শেষে অভিধান-তালিকার বিষয় সম্বন্ধে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

তালিকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার পর তালিকার রূপ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে তালিকা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা দেখিয়ে দিতে হবে। যেমন কার্ড তালিকা হলে কার্ডগুলি পাশের দিক থেকে একে একে সরিয়ে দেখতে হয় ইত্যাদি।

জাতি-বিচার

পুস্তকের জাতি-বিচার সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার সময় ছাত্রদের মনে এমন একটা ধারণা করে দেওয়া উচিত নয় যাতে ছাত্ররা মনে করে পুস্তকের জাতি-বিচার একটা ভীষণ কঠিন কাজ। প্রথম তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে মঞ্চে কেন কোন একটা নিয়মানুযায়ী বই সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন, বই সাজিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য কি। এবং পরে তাদের জানাতে হবে বইয়ের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বই সাজিয়ে রাখার স্বার্থকতা কি।

গল্প বা উপন্যাস গ্রন্থাগারে যদি আলাদা করে সাজান হয়ে থাকে, কেন তা আলাদা করে সাজান হল, গল্প বা উপন্যাস থেকে অন্য বইয়ের তফাত কি ?

Dewey-র ছকের প্রথম দশটি বিভাগ ছাত্রদের প্রথম ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। পরে তাদের জানাতে হবে এই দশটি বিভাগের প্রত্যেক বিভাগটিকে আবার দশটি করে ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সে বিভাগ করা হয়েছে বিষয়

পরম্পরা অনুযায়ী। Dewey-র দশটি বিভাগ ছাত্রদের জানাবার পর ছাত্রদের মঞ্চে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে এই দশটি বিভাগকে কিভাবে মঞ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে।

ক্রমে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে কিভাবে এক একটি বিভাগকে বার বার দশটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিভাগে আসা হয়েছে।

এ ভাবে ছাত্রদের যখন জাতি-বিচার সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে যাবে, তখন তাদের Dewey-র ছকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলি বুঝিয়ে দিতে হবে। ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, রূপগত বিভাগ এগুলি জানা তাদের বিশেষ প্রয়োজন।

বইয়ের ব্যবহার

বইয়ের ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে, বই একটি মূল্যবান বস্তু। জ্ঞানার্জন করবার জন্যে কিভাবে বইয়ের সাহায্য নেওয়া দরকার?

বই সাবধানে ব্যবহার করা দরকার তা না হলে বইয়ের পাতা ও সেলাই ছিঁড়ে যেতে পারে। বই নোংরা করা উচিত নয়, বইয়ে দাগ দেওয়া, বইয়ের পাতার উপরে দাগ দেওয়া, বইয়ের পাতা মোরা এ-সব কাজ অন্যায়। বই কিভাবে মঞ্চ থেকে বার করতে হয়, মঞ্চ থেকে কি ভাবে বই টেনে বার করলে বইয়ের বাঁধাই ছিঁড়ে যাওয়া সম্ভব, কিভাবে বার করলে বই ছেঁড়বার সম্ভাবনা থাকে না, কিভাবে বইয়ের ধুলা ঝাড়তে হয়—মঞ্চের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এসব বিষয় ছাত্রদের হাতেনাতে করিয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার। বই পড়বার সময় কিভাবে তা খুলতে হয়, দুটি মলাট উল্টে মুড়ে ধরলে বইয়ের বাঁধাই ছিঁড়ে যাওয়া সম্ভব—এসব বিষয়গুলি ছাত্রদের দেখিয়ে দিতে হবে।

বইয়ের বিভিন্ন অংশ। কোন্ অংশের কাজ কি, কোন্ অংশ থেকে কি বিষয় জানা যায় তা ছাত্রদের শিখিয়ে দিতে হবে।

তারপর ছাত্রদের শেখাতে হবে একখানি বই থেকে জ্ঞানার্জন করতে গেলে কিভাবে তা পড়তে হয়। অনুসন্ধান পুস্তকগুলির চরিত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া দরকার। অনুসন্ধান পুস্তক বলতে কি বোঝায়, অন্য বইয়ের সঙ্গে অনুসন্ধান পুস্তকের তফাত কোথায়, অনুসন্ধান পুস্তকগুলির বিষয়বস্তুগুলির সাধারণতঃ কিভাবে সাজান হয়—এসব বিষয় ছাত্রদের স্কুল থেকেই বিশেষ ভাবে জানা দরকার।

বিদ্যোদয়ের বই : প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

ভারত মহিলা	৩·৮০	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র	৬·০০	সংকলন
বঙ্কিম-বরণ	৬·৫০	মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্য-বিতান	৯·৫০	মোহিতলাল মজুমদার
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা		ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য
[পেপার ব্যাক : জ্যাকেট মোড়া	৯·০০	॥ বোর্ড বাঁধাই ৯·৫০]
ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৭·০০	ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন	১০·০০	ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য
নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা	১৩·০০	ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : প্রথম খণ্ড	১০·০০	নেপাল মজুমদার
অলিম্পিকের ইতিকথা	২৫·০০	শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
চিত্রদর্শন	২৫·০০	কানাই সামন্ত
মানব-বিকাশের ধারা	১২·০০	প্রফুল্ল চক্রবর্তী
সাহিত্য ও সমাজ মানস	৬·০০	নারায়ণ চৌধুরী
লেখকদের প্রেম	৩·০০	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা	৪·৫০	কপিল ভট্টাচার্য
পরিভাষা কোষ	১০·০০	সুপ্রকাশ রায়
শতাব্দীর শিশুসাহিত্য	৭·০০	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
পরিব্রাজকের ডায়েরী	৪·৫০	নির্মলকুমার বসু
বক্তব্য	৫·০০	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্তালিন যুগ [অনুবাদ]	৩·২৫	আনা লুইস্ স্ট্রং
স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ	২·৫০	অনিলা দাশগুপ্ত
অর্ধশতাব্দী	৪·০০	সংকলন
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩·৫০	অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ঃ — ৩·৭০

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯